ডিসেম্বর ২০২০ ❑ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৭

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

আষাঢ়ের বিজয়

মুমিনা নাহার সুষমা, ৫ম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

ঐশী দফাদার, ৮ম শ্রেণি, রংপুর কালীতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

অ্যাডহক প্রকাশনা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

করোনার বিস্তার প্রতিরোধে

নো মাস্ক নো সার্ভিস

মাস্ক নাই তো সেবাও নাই

মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-45, No-6, December 2020, Tk-20.00

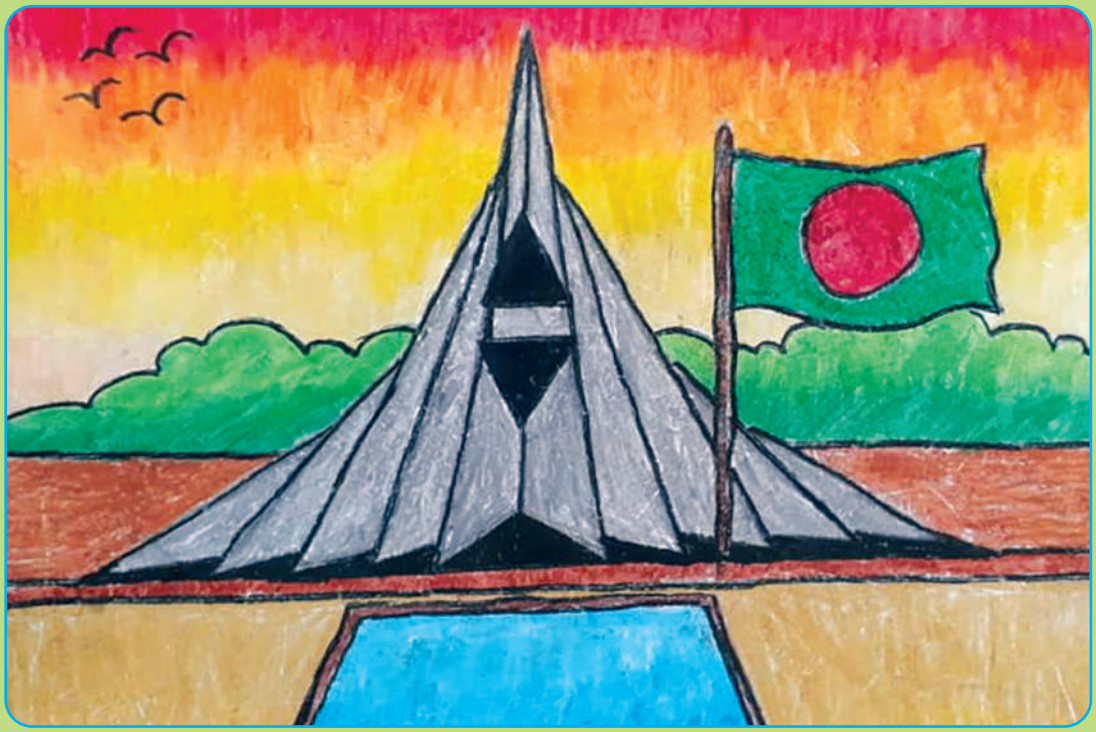

সাইবা হোসেন পুণ্য, ১ম শ্রেণি, সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

ডিসেম্বর ২০২০ ❑ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৭

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মো. হুমায়ুন কবীর

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
মো. মাছুদ আলম

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, তোমরা তো সবাই জানো ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস। ত্রিশ লাখ শহিদ ও দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির অশ্রুভেজা এই দিনে আমরা পরাধীনতার শিকল ভেঙে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। পৃথিবীর মানচিত্রে যুক্ত হয় বাংলাদেশ নামের একটি নতুন দেশ। তাই এই দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বন্ধুরা, যে মানুষটির হাত ধরে আমরা এই মহান বিজয় পেয়েছি তিনি হলেন আমাদের সকলের প্রিয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর আহ্বানেই এই দেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নয় মাস মরণপণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই মাসে জাতি হারিয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদেরও।

তাই এই দিনে আমরা পরম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় স্মরণ করি মহান বীর শহিদদের। আবার এই দিন আমরা আনন্দ ও উৎসব করি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ের জন্য।

ছোট্ট বন্ধুরা, ৩রা ডিসেম্বর পালিত হয় ২৯তম আন্তর্জাতিক ও ২২তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত এ দিবসটি ১৯৯২ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে।

করোনাকালীন এই সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিকল্প নেই। সাবান দিয়ে প্রতিনিয়ত হাত ধোয়া ছাড়াও মুখে মাস্ক আর হাতে গ্লাভস পরে বাইরে যেও। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আর বেশি বেশি পানি পান করবে। নিরাপদে ও সাবধানে থাকো। নিরন্তর শুভেচ্ছা। ■

সূচি

নিবন্ধ

৪ আমাদের বিজয়/মিজানুর রহমান মিথুন
৭ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস/খান চমন-ই-এলাহি
২৫ স্মারকে বিজয়/মো. শাহীন হোসাইন
৩২ মুক্তিযুদ্ধে ভিনদেশি বন্ধুরা/বিনয় দত্ত
৪৪ মুক্তিযুদ্ধে প্রথম কিশোর শহিদ/শামস সাইদ
৪৯ কেমন ছিল সেই দিন/শাহানা আফরোজ
৫২ নারী শিক্ষার অগ্রদূত/ইশরাত জাহান
৫৩ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৪ সাদাত রহমান আমাদের অহংকার/ফারুক আহমেদ খান
৫৬ সাইবার বুলিং কী/বাদল হোসেন
৫৭ বাংলাদেশে আসা হলো না/মঞ্জুর করীম খান
৫৮ নিপাহ ভাইরাস: সচেতনতাই মুক্তি/মো. জামাল উদ্দিন
৫৯ বর্ষসেরা শিশু গীতাঞ্জলী/জান্নাতে রোজী
৬০ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৬১ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ
৬৩ বুদ্ধিতে ধার দাও অক্টোবর ২০২০ -এর সমাধান

স্মৃতিকথা

১০ বীর মুক্তিযোদ্ধা লোকমান ও তার পরিবার/আমিরুল হক

ছোটোদের লেখা

৩৯ মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গ সোনাহাট ব্রিজ
রিফাত নাহার দিশা
৪২ রক্ত দিয়ে তৈরি/সারাফ নাওয়ার

গল্প

২০ অন্যরকম মুক্তিযুদ্ধ/রফিকুর রশীদ
২৬ আরেক মীরজাফর/মুস্তাফা মাসুদ
৪৬ বোকা কমান্ডার/আরিফুল ইসলাম সাকিব

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিতা

৯ বেণীমাধব সরকার/ নওশিন সায়েরা পুষ্পিতা
ড. নূরুল হুদা মামুন

কবিতাগুচ্ছ

১৭ গোলাম নবী পান্না/শাফিকুর রাহী
১৮ মিয়াজান কবীর/কামাল হোসাইন
মো. মাসুদুর রহমান
১৯ মুহাম্মদ ইসমাঈল/নুসরাত জাহান
সাঈদ তপু/রকিবুল ইসলাম
৩১ শচীন্দ্র নাথ গাইন
৪৩ সাবিত্রী রাণী/বেগম দিলরুবা খালিদা আমিন
৪৮ মঈনুল হক চৌধুরী/মো. কামাল শেখ
৫১ জাফরুল আহসান
৫৬ মোরশেদ কমল

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : মুমিনা নাহার সুষমা/ঐশী দফাদার
শেষ প্রচ্ছদ : সাইবা হোসেন পুণ্য
৪১ আবদুল্লাহ আল মুকিত
৪৫ এস.এম রেহাম রামিন
৬৪ শুভ সরকার/কায়নাত মারিয়া

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

১৬ ডিসেম্বর

আমাদের বিজয়

মিজানুর রহমান মিথুন

প্রতি বছরের মতো এসেছে মহান বিজয় দিবস। আগামী বছর আমরা বিজয় দিবসের ৫০ বছর পালন করব। সত্যিই ভাবতে ভীষণ আনন্দ লাগছে। আমাদের জাতীয় জীবনে এ এক খুশির দিন।

অনেক হারানোর বেদনা থাকলেও আমরা বিজয় দিবসকে উৎসবের দিন হিসেবে পালন করি। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এ বিজয় আমরা অর্জন করি। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে শুরু হয় নতুন অধ্যায়।

বিজয়ের দিনে আমরা বিভিন্ন আকৃতির জাতীয় পতাকা দিয়ে শহর, নগর, বন্দর, গ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘর সাজিয়ে তুলি। যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। পরম মমতায় পতাকাগুলো বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে।

ভাবতে ভালো লাগে এই পতাকার জন্য সেদিন আমরা অকাতরে জীবন দিয়েছি। 'আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ, প্রিয় পতাকা' কেউ কোনো দিন এ পতাকা কেড়ে নিতে পারবে না। আহ্ কী আনন্দ! ভালোবাসা আর আনন্দে হৃদয়-মন নেচে ওঠে।

আজ এ আনন্দে নিজেদের খুঁজে পাই সম্মান ও মর্যাদার আসনে। কারণ এ বিজয় আমাদের সংগ্রামের অর্জন, অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে শত্রুর হাত থেকে বিজয় ছিনিয়ে এনেছি। পেরিয়ে এসেছি এক নদী রক্ত। তাই তো এ বিজয় আমাদের কাছে অনেক দামি, গর্বের এবং সীমাহীন ভালোবাসার।

প্রতি বছর ডিসেম্বর এলেই বিজয়ের আনন্দে আমরা জেগে উঠি। গেয়ে যাই প্রিয় স্বদেশের গান। ফিরে যাই আগুন ঝরা উত্তাল সেই '৭১-এর দিনগুলোতে। গর্ব করে বলতে ইচ্ছে হয়– আজ বিশ্বে আমরা মর্যাদার আসন পেয়েছি।

'মুক্তিযুদ্ধ'- আমাদের জাতীয় জীবনে একটি শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়ের নাম। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। তাই এ অহংকার ও গর্বের কথা আমরা বার বার বলতে ভালোবাসি।

আমরা কথায়, গল্পে, নাটক কিংবা গানে- প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবো মুক্তিযুদ্ধের অমর-অঝর ও শ্বাসরুদ্ধকর ইতিহাস। যে ইতিহাস জেনে তারা জাতি গঠনের শেকড়ের কথা জানতে পারবে।

১৯৭১ সালে আমাদের দেশের দামাল ছেলেরা দেশ, মাটি ও মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে গর্জে উঠেছিল। শত্রু তাড়াতে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। তারা প্রাণ বাজি রেখে লড়াই করেছিল। তাদেরকে আমরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে রেখেছি। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের সূর্য সন্তান।

দেশের বিজয়ের পেছনে বেশ কিছু বিদেশি নাগরিকদেরও ছিল অসামান্য অবদান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শুরু থেকেই বিদেশি নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ ছিল। তারা নিরস্ত্র বাংলাদেশিদের হত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধের খবর কেউ পৌঁছে দিয়েছিলেন লেখার মাধ্যমে, কেউ ছবি তুলে। আমরা শ্রদ্ধা জানাই তাঁদেরকেও।

একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আমরা আজ পরিচয় দিতে পারছি। এই পরিচয়দানের পেছনে যাদের আত্মদান রয়েছে তাদের জানাই শ্রদ্ধা এবং গভীর ভালোবাসা। আমরা আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি। দেশের জন্য এ ভালোবাসা চিরদিন অটুট থাকবে। সবার উচিত দেশকে ভালোবাসা। দেশের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হয় না। মাতৃভূমির জন্য প্রেম, সব প্রেমের সেরা।

যাদের অন্তরে দেশপ্রেম নেই, তারা কোনোদিন আদর্শ নাগরিক হতে পারে না। দেশের উপকারে যার মন নেই সে আসলেই প্রকৃত মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। কবিতার ভাষায় এমন করে বলা যায়,

'স্বদেশের উপকারে নেই যার মন
কে বলে মানুষ তারে?
পশু সেই জন।'

প্রকৃত মানুষ এবং সুনাগরিক হতে হলে দেশকে ভালোবাসতে হবে। দেশের উপকারে নিজেকে সব সময় নিয়োজিত রাখতে হবে। যে মাটির মমতায় বেড়ে উঠি তাকে ভালোবাসতে না পারলে মানুষ হিসেবে জন্ম নেওয়া ব্যর্থ হবে।

দেশের জন্য ভালোবাসা না থাকলে দেশের জন্য কাজও করা যায় না। দেশের জন্য কাজ না করতে পারলে দেশের কোনো দিন উন্নতি হবে না। দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে না। দেশ যদি এগিয়ে যেতে না পারে আমরাও পড়ে থাকব পেছনের সারিতে। বিশ্বের বুকে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না।

আমরা এগিয়ে যেতে চাই সামনের দিকে। হতে চাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্নকে শুধু স্বপ্ন হিসেবে দেখলে হবে না; এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। এতে আমাদের ছোটো-বড়ো সবারই কম-বেশি দায়িত্ব রয়েছে।

যারা আজ ছোটো তারা লেখাপড়া করে শিক্ষিত হয়ে দেশকে গড়ে তোলার জন্য কাজ করবে। আমাদের দেশ, দেশের মাটি ঠিক মায়ের মতো। এ দেশকে গড়ে তুলব নিজের মেধা, শ্রম এবং সাধনায়। এবারের বিজয় দিবসে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। ■

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

খান চমন-ই-এলাহি

আমাদের মহান স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ আর বিজয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। দিনটি বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাসে শোকাবহ এক স্মরণীয় অধ্যায়। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর আমরা হারিয়েছি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। তাই প্রগাঢ় ভালোবাসায় জাতি স্মরণ করে শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের। বুদ্ধিজীবীরা বুকের রক্ত দিয়ে লাল সবুজের পতাকা, মানচিত্র আর জাতীয় সঙ্গীত এনে দিয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত পথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের পরও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর মধ্যে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস প্রত্যেক বাঙালির হৃদয়ে অনুপ্রাণীত ও উজ্জীবিত করেছে।

বন্ধুরা, তোমরা কি জানো বুদ্ধিজীবী কাদের বলা হয়? বুদ্ধিজীবী হলো দৈহিক শ্রমের বদলে মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ব্যবহার ও প্রয়োগ ঘটিয়ে দেশ গঠনে অবদান রাখেন। আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায়, বিখ্যাত কবি, লেখক, বিজ্ঞানী চিত্রশিল্পী, গবেষক, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, রাজনীতিক, সংস্কৃতিসেবী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, চলচ্চিত্র ও নাটকের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজকর্মী যারা দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার চিন্তা করেন।।

বাংলাদেশ যাতে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দীর্ঘ নয় মাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, রাজাকার, আলবদর, আলশামস, শান্তি কমিটি পাকিস্তান সরকারের পক্ষে কাজ করে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, লুটপাট করে। নারীর সম্মান নষ্ট করে। পাকিস্তান সরকার ও রাজাকারের দল বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করবার জন্য নীল নকশা তৈরি করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা যাতে টিকে না থাকে তার জন্য ১০ থেকে ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় দেশের বিশিষ্ট ও প্রতিভাবান মানুষদের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এসব বুদ্ধিজীবীদের নিথর দেহ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে। কাউকে আবার সেখানেও পাওয়া যায়নি। প্রায় বারোশ বুদ্ধিজীবীর কথা কারো অজানা নয়।

যে সকল বুদ্ধিজীবী শহিদ হয়েছেন তার মধ্যে ৯৮৯ জন শিক্ষাবিদ, ১৩ জন সাংবাদিক, ৫০ জন চিকিৎসক, ৪১ জন আইজীবী, এছাড়া শিল্পী, প্রকৌশলী, সংস্কৃতিসেবীসহ আরো প্রায় ১৬ জন। [বাংলাদেশ: প্রথম বিজয় দিবস বার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মারকগ্রন্থ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে তথ্য সংকলিত, পৃষ্ঠা ৮৮-৯০]

রায়েরবাজার বধ্যভূমি

আশার কথা যে বর্তমান সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। ১২২২ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর নাম অন্তর্ভূক্ত করে ১৩ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে একটি প্রাথমিক তালিকা চূড়ান্ত করেছে।

৭ মার্চ ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা'।-ঘোষিত হবার পর ২৫শে মার্চ ১৯৭১ থেকে বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল বুদ্ধিজীবী শহিদ হন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মুনীর চৌধুরী, ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ড. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, হুমায়ুন কবির, রাশিদুল হাসান, সন্তোষ ভট্টাচার্য, এ. মুকতাদির, ফজলুর রহমান খান, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, এম.এ. সাদেক, আনোয়ার পাশা, ড. সিরাজুল হক খান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. হাবিবুর রহমান, মীর আব্দুল কাইয়ুম, ড. শ্রী সুখরঞ্জন সমদ্দার। চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. আব্দুল আলিম চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দীন আহমেদ, অধ্যাপক ডা. মোহম্মদ ফজলে রাব্বি, ডা. সোলায়মান খান, ডা. আয়েশা বদেরা চৌধুরী, ড. কসির উদ্দিন তালুকদার, ডা. মফিজউদ্দীন খান, ডা. এস. কে. লালা, ডা. আজহারুল হক, ডা. হেমচন্দ্র বসাক, ডা. মোহাম্মদ শফী, ডা. আসাদুল হক, সাংবাদিক লেখক শহীদুল্লাহ কায়সার, সাংবাদিক সেলিনা পারভীন, সাংবাদিক নিজামুদ্দীন আহমেদ, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, গীতিকার-সুরকার আলতাফ মাহমুদ, সমাজসেবক রনদাপ্রসাদ সাহা, রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, চলচ্চিত্রকার ও লেখক জহির রায়হান, শিক্ষাবিদ ড. আবুল কালাম আজাদ, কবি মেহেরুন্নেসা, আইনজীবী নাজমুল হক সরকার প্রমুখ।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের মধ্য দিয়ে আমরা শ্রদ্ধা জানাই শহিদ মেধাবী, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দেশপ্রেমিক সন্তানদের। যাদের জন্য পেয়েছি স্বাধীনতা। অর্জন করেছি বিজয়। আর আমাদের অন্তরে রচনা করি সোনার বাংলার ছবি-বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা। এসো সবাই মিলে, সমস্বরে গাই- আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক ও আইনজীবী

খোকা

বেণীমাধব সরকার

টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নিল
একটি খোকা হেসে,
বড়ো হলো মা মাটিকে
গভীর ভালোবেসে।
ফুল-পাখি আর নদীর সাথে
ভাব ছিল তার কত
স্বদেশ প্রেমের ফল্গু প্রাণে
বইত অবিরত।
তাঁর ভাষণে বাঙালিরা
সবাই হলো এক,
মুজিব নামের সেই ছেলেটি
শেখের ব্যাটা শেখ।
পাক হায়েনা হানা দিল
বাংলা মায়ের বুকে,
বীর পুরুষের মতোই খোকা
ওদের দিল রুখে।
মুক্ত হলো বন্দি মাতা
মুক্ত হলো দেশ,
আকাশ পরে বিজয় নিশান
উড়ল আহা বেশ!

বঙ্গবন্ধু তাঁর নাম

নওশিন সায়েরা পুষ্পিতা

তাঁর ডাকে বীর বাঙালি
যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে
নয় মাস যুদ্ধ করে
বিজয় নিয়ে ঘরে ফিরে।

তিনি ছিলেন বলেই মোরা
পেয়েছি প্রিয় স্বদেশ
বঙ্গবন্ধু মানেই আমাদের
লাল-সবুজের বাংলাদেশ।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, চিলাহাটি গার্লস স্কুল, নীলফামারি

খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু

ড. নূরুল হুদা মামুন

টুঙ্গিপাড়ার ছোট্ট খোকা
শেখ মুজিবুর নাম,
খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু
জগৎ জোড়া দাম।

মহৎ মনের মানুষ ছিলেন
ভালোবাসতেন দেশ,
স্বাধীন করে এনে দিলেন
সোনার বাংলাদেশ।

তাই তো তাঁকে ভালোবাসে
দেশের জনগণ,
দেশকে সবে ভালোবাসব
এই করেছি পণ।

স্মৃতিকথা

বীর মুক্তিযোদ্ধা লোকমান ও তার পরিবার

আমিরুল হক

কুসুমপুরের গোলজার আহমেদ একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক। তার একমাত্র কন্যা আশালতা। অনেক গুণে গুণান্বিত আশালতা।

সলিমপুরের নিবাসী হায়দার খানের পুত্র লোকমান খানের সাথে আশালতার বিয়ে হয়। লোকমান একজন আদর্শবাদী, সৎ এবং নিষ্ঠাবান ছেলে। সলিমপুর হাই স্কুলে শিক্ষকতা করে। লোকমানকে গ্রামের সবাই খুব ভালো জানে এবং ভালোবাসে। স্কুলের সকল শিক্ষার্থী লোকমানের দারুণ ভক্ত। ক্লাসে সুন্দর করে বুঝিয়ে পড়ান তাই শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে। ভালো পড়ান বলে তার ক্লাসে অনুপস্থিতির সংখ্যা নেই বললেই চলে। লোকমানের পড়াবার কৌশলই একটু আলাদা। অন্য কারো সাথে তুলনা চলে না। মজা করে পড়ায় বলে তার ক্লাসে কারো ফাঁকি দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। আর এজন্য সবাই ভালো রেজাল্টও করে। তাই ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকদের কাছে লোকমান একজন প্রিয় শিক্ষক। শুধু কী তাই! সলিমপুরবাসীর কাছেও সমান প্রিয় মানুষ। মানুষের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ায়। কারো কোনো কিছু হলে সবার আগে তাকেই দেখা যাবে। মানুষের উপকার করাটা তার আর একটা ভালো গুণ। সমাজের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সে আনন্দ পায়। কারো উপকার করতে না পারলে সেদিন তার খারাপ লাগে। মনে ভীষণ কষ্ট পায়। লোকমানের এ ধরনের কাজের জন্য এলাকাবাসীর হৃদয়ের মণিকোঠায় একটা বিশেষ জায়গা করে আছে সে।

লোকমানের জনপ্রিয়তা আর তার বিশেষ গুণের কারণে মুগ্ধ হয়ে কুসুমপুরের বিশিষ্ট সমাজসেবক গোলজার আহমেদ তার একমাত্র আদরের মেয়ে আশালতার সাথে লোকমানের বিয়ে দেন। আশালতাকে নিয়ে লোকমানের সুখেই দিন কাটে। আশালতা লোকমানের বাড়ির সকলের সাথে মানিয়ে নিয়ে মিলেমিশে সংসার করে। তবে সে সুখ আর বেশিদিন থাকেনি। যে সময়টায় আশা-লোকমানের বিয়ে হয় সেই সময়টা ছিল ভীষণ উত্তপ্ত। গণ-আন্দোলনের জোয়ারে সমগ্র দেশ তখন ভাসছিল, ছিল উত্তাল। পাক-প্রশাসনের দমন নীতির শিকার বাঙালি জাতি। তাদের তাণ্ডবের ফলে একটা অস্থির সময় পার করে। কোথাও কোনো সুস্থ পরিবেশ নেই। দিন দিন তাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়তেই থাকে। গণ-জোয়ারকে কিছুতেই তারা সামাল দিতে না পেরে দমন পীড়নের পথ বেছে নেয়। দেশের এমন পরিস্থিতির বাস্তব প্রভাব তাদের সংসারেও এসে পড়ে। এমতাবস্থায় হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোনো অবকাশ নেই। তাই লোকমানকে দেশের জন্য একটা কিছু করতেই হবে। পরিস্থিতির তাগিদে লোকমান সংসারে একটুও সময় দিতে পারে না। সারাক্ষণ বাইরেই থাকতে হয় তাকে। দেশের এই আন্দোলনে, এই সংগ্রামে আশালতাও সমান অংশীদার। শিক্ষকতা পেশাকে আশালতা মহান পেশা মনে করে। তাই লোকমানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তার প্রতিটি কাজেকর্মে দারুণভাবে সহযোগিতা করে আশালতা। লোকমানের সাথে কখনো বিরূপ আচরণ করেনি বা কখনো ভুল বোঝাবুঝি হয়নি। পরিবারের সবার চাহিদা পূরণ করার মাঝে আশা আনন্দ খুঁজে নেয়। আশাও সবার ভালোবাসা-সম্মান পায়। দেশের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও সকল দায়িত্ব-কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করে। দেশ ও জাতির সেবা করার মন মানসিকতা দুজনেরই সমান। আশা লোকমানকে বলে তুমি বাইরে সামলাও আর আমি সামলাবো ঘর। তাই বাইরের কোনো কাজে আশা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আশারও কোনো কাজে বা সিদ্ধান্তে লোকমান বাঁধা দেয়নি। অবসর সময় যেটুকু পায় তার মধ্যে দেশ হচ্ছে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। আর বাকি যে সব কথাবার্তা তার মধ্যে রয়েছে কীসে ভালো হবে, কী করলে সবার মঙ্গল হবে। লোকমানের একমাত্র ছেলে 'সংগ্রাম'। তখন বাবা কী জিনিস তা তার ধ্যানজ্ঞানেও সেই বোধটুকু আসেনি। বাবার আদর-স্নেহ-ভালোবাসা সে কিছুই পায়নি। সংগ্রামের বয়স যখন ছয় মাস তখন লোকমান দেশ মাতৃকার টানে সব পিছুটান উপেক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধার খাতায় নাম লিখাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান কোনোটাই তাকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। দেশের চাইতে বড়ো আর কিছু হতে পারে না। এটা ভেবে শেষ পর্যন্ত সংসার পরিবারের চাইতে দেশকে বেছে নিয়ে জীবন বাজি রেখে ছুটে যায় দেশকে স্বাধীন করবে বলে।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পাক প্রশাসন বাঙালিদের সাথে নানারকম বৈষম্যমূলক আচরণ করে আসছে। কী অর্থনৈতিক, কী সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ সুবিধা থেকেও বাঙালিরা বঞ্চিত। অথচ আয়ের সিংহভাগ অর্থ যোগান দেয় পূর্ব বাংলা। তারা কখনোই বাঙালিদের ভালো চোখে দেখেনি। বাঙালিরা সবসময়ই তাদের নির্যাতন নিপীড়নের শিকার। ন্যায্য অধিকার থেকে হয়েছে বঞ্চিত। কিছু না পেতে পেতে যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন প্রতিবাদ ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ থাকে না। বাংলার মানুষ অল্পতেই তুষ্ট। মোটা কাপড় মোটা চালের ভাত পেলেই খুশি। শান্তিপ্রিয় বাংলার মানুষের কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু চাওয়ার নেই। তা সত্ত্বেও তারা নিগৃহিত ও নির্যাতিত। পাক প্রশাসন বাংলার মানুষের ন্যায্য অধিকারের উপর চালিয়েছে দমননীতি। তাদের অত্যাচার-অনাচার সহ্য করতে পারেনি বাংলার নিরীহ মানুষ। তাদের জমাট বাঁধা কষ্টগুলো আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো বুকে ফুঁসে ওঠে। তাই সেদিন সমগ্র বাঙালি জাতির পক্ষে এ দেশের সূর্য সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাল শক্ত হাতে ধরেন। প্রতিটি সংগ্রাম, প্রতিটি আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে বেগবান করে তোলেন। ফলশ্রুতিতে সব বৈষম্যের বিরুদ্ধে শুরু হয় মুক্তিসংগ্রাম। মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার মানুষ জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শত্রুর মোকাবিলা

করার জন্য ছাত্র শিক্ষক, কৃষক শ্রমিক, কামার কুমার, জেলে তাঁতি, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসারসহ বাংলার সকল স্তরের মানুষ সেদিন কেউ ঘরে বসে থাকেনি। সেদিন দেশপ্রেমিক লোকমানও সেই মহান নেতার ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ তাগিদে সবকিছু ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়।

বাংলার চারদিকে বারুদের গন্ধ আর মৃত মানুষের লাশ যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিভিষীকাময় পরিবেশ। ভয়, আতঙ্ক আর শঙ্কা নিয়ে মা-বোনেরা দিন কাটায়। পাক সেনা আর পাঞ্জাবি পুলিশ অলিতে গলিতে পাহারা দেয়। পাড়ায়, মহল্লায় তরুণ যুবক ছেলেদের খুঁজে বেড়ায়। তাদের মুক্তি নামে অভিহিত করে। নাগালে পেলে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে। আর না পেলে গ্রাম পাড়া মহল্লার বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। আর এসব অপকর্মের দোসর এ দেশের দালাল চক্র রাজাকার, আলবদর, আল শামস। এসব নরপিশাচেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দালালি করত। এদের ছিল না কোনো দয়া, ছিল না কোনো মায়া। এ দেশের হাজার হাজার মা-বোনেরা এদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তাদের চেহারার মধ্যে বর্বরতা আর নিষ্ঠুরতার ছাপ ফুটে ওঠে।

এদিকে আশালতা তার সন্তান 'সংগ্রাম'কে নিয়ে দারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করে। পাক বাহিনীর দোসররা প্রতিদিন লোকমানের খোঁজ করে। তারা লোকমান কোথায় আছে তা জানতে চায়। নানা কথা বলে আশাকে ভয় দেখায়। লোকমানের বাবা-মাকেও চাপ দেয়। কিন্তু কোথায় আছে তা তারা বলতে পারে না। অনুনয় বিনয় করে বললেও দালালেরা বিশ্বাস করে না। এভাবে যতই দিন যায় ততই শঙ্কা বাড়তে থাকে। দালালরা এমনভাবে বিরক্ত করে যা বলে শেষ করা যায় না।

লোকমানের একমাত্র ছেলে সংগ্রামকে বুকে আঁকড়ে ধরে আশালতা বাঁচতে চায়। সংসারের একমাত্র রোজগেরে ছিল লোকমান। লোকমান না থাকায় সংসারে টানাপড়েনে কোনোভাবে দিন কাটে। আধা পেট খাওয়া না খাওয়ার মাঝে দিন চলে। বৃদ্ধ বাবা তাদের তো কোনো গতি নেই। এই অবস্থায় কোথায় যাবে, কী করবে ভেবে কুল পায় না। বাবা-মায়ের মন তো তাই ছেলের চিন্তায় সারাক্ষণ অস্থির থাকে। ছেলে কোথায় আছে, কীভাবে আছে, কেমন আছে, বেঁচে আছে না মরে গেছে তা কিছুই জানে না। এমনিতেই তাদের মন মানসিকতার যে অবস্থা তার উপর আবার পাক সেনা আর দালালদের অত্যাচার। এসব মুখ বুজে সহ্য করে এক একটি দিন পার করে।

যুদ্ধ বিগ্রহের মাঝে সংগ্রাম বড়ো হতে থাকে। কবে যুদ্ধ শেষ হবে কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। আশালতা সংগ্রামকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে আর ভাবে এর শেষ কোথায়। তার স্বামী কবে ফিরবে, আদৌ ফিরবে কিনা তাও সে জানে না। এদিকে দিন দিন সংকট বেড়েই চলেছে। নরপিশাচের চোখ ফাঁকি দিয়ে সংগ্রামকে বুকে নিয়ে কতবার যে জঙ্গলে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে তার হিসাব নেই। সংসারের এত টানাপড়েনে, এত দুরবস্থার মধ্যে থেকেও আশালতা এতটুকুও ভেঙে পড়েনি। বুক বেঁধে আছে লোকমানের অপেক্ষায়। সে জানে না তার ভাগ্যের শিকে খুলবে কিনা। দীর্ঘ নয়টি মাস হানাদার বাহিনীর অত্যাচার অনাচার আর তাদের বর্বরতার রোশানল থেকে বেঁচে থাকা যে কত কষ্টের কত যন্ত্রণার তা বলে শেষ করা যাবে না। ছেলের সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেনি বলে তারা লোকমানের বাবাকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে। এতে করে লোকমানের মাকে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়। স্বামী-সন্তানের শোকে শেষ পর্যন্ত তিনিও ইহলোক ছেড়ে চলে যান। পাক সেনা ও তাদের দোসররা তাণ্ডব চালিয়ে কত মা-বোনের সম্ভ্রম কেড়েছে, কত স্বামী সন্তানকে হারাতে হয়েছে তার হিসাব মিলাতে গেলে গা শিউরে ওঠে। এদের ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রেহাই পাওয়াটা ছিল ভাগ্যের ব্যাপার। এদের ছিল না কোনো হিতাহিত জ্ঞান। এরা দয়ামায়া-মমতা বিবেক বর্জিত নরপশু।

দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর অনেকেই স্বাধীন বাংলার মাটিতে পা রাখে। চেনাজানার মধ্যে যারা যুদ্ধে গিয়েছিল তাদের অনেকেই ফিরে আসে।

দিনের পর দিন আশালতা লোকমানের জন্য অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকে। অপেক্ষা অপেক্ষাই রয়ে যায় কিন্তু স্বামীর দেখা মেলে না। কী আর করবে বেচারি, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সান্ত্বনা খুঁজে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কী। আপনজন, আত্মীয়স্বজন হারিয়ে আশালতা পাগল প্রায়। এত বড়ো পৃথিবীতে সে বাঁচবে কেমন করে? আশার অন্তহীন ভাবনা সারাক্ষণ তার মন প্রাণকে ঘিরে রাখে। নয় মাসের মধ্যে এত সব ঘটনা যা ইতিহাসের পাতায় লেখা হবে তা কি ভেবেছে আশা? পৃথিবী বড়ো কঠিন।

এখানে বাঁচতে হলে কঠিন থেকে কঠিনতরো সংগ্রাম করে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হবে। স্বামীর ভিটে আঁকড়ে ধরে সংগ্রামকে নিয়ে আশালতা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। মুক্তিযুদ্ধে স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, বাবা-মাকে হারিয়ে আশালতা প্রায় নিঃস্ব। যুদ্ধকালীন এক একটি সময়ের ভয়াবহ বিভীষিকাময় স্মৃতি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার চোখের সামনে অনেককে চলে যেতে দেখেছে। যারা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। অনেক স্বপ্ন বুকে করে সে লোকমানের ঘরে আসে। যে সংসারে ছিল না কোনো অভাব, ছিল না কোনো অভিযোগ। হাসিখুশি ভরা ছিল তাদের সংসার। এরই মাঝে তাদের ঘর আলো করে আসে 'সংগ্রাম'। সংগ্রামকে নিয়ে তাদের অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা। ছেলে বড়ো হবে। মানুষের মতো মানুষ হবে। এসব স্মৃতিচারণ করে আশালতা চোখের জলে বুক ভাসায়।

চূড়ান্ত বিজয় শেষে সবাই যখন ফিরে আসে তখন ঘরে ঘরে চলে বিজয় আনন্দ। যারা ফিরে আসেনি তাদের বাড়ির সকলের মনের অবস্থা কী হতে পারে তা ভুক্তভোগীরাই জানে। না ফেরার দলের ভাবনায় ব্যথিত হয়ে থেকে যায় আশালতা। সংগ্রামকে নিয়ে আশা একটা কঠিন সময় পার করে। সে চায় ঘুরে দাঁড়াতে। জীবনকে নতুনভাবে গড়তে। সবাই যখন বিভিন্নভাবে পুনর্বাসিত হয় সে তখন একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী এই অহংকারবোধকে পুঁজি করে একটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকার চাকরি নেয়। শিক্ষিকা পেশাটা অত্যন্ত সম্মানের তাই মানুষ গড়ার কারিগরের চাকরিটা হাতছাড়া করেনি। সংগ্রাম তখন খুব ছোট্ট। ওকে রেখে কর্মস্থলে যাওয়াটা খুবই কষ্টকর। তবে কষ্টের হলেও সবকিছু মোকাবিলা করার সাহস আর মানসিকতা নিয়েই নতুন জীবনের পদযাত্রা শুরু করে আশালতা। এক দিকে সংসার সামলানো অন্য দিকে কর্মস্থল দুটোই তার কাছে সমান সম্মানের, সমান মর্যদার।

লোকমানের ইচ্ছা পূরণের দায়িত্বটা আশালতা খুব সুন্দরভাবে পালন করে। কোথাও এতটুকু খুঁত রাখেনি। আশালতা আদর্শবাদী মেয়ে। বাবা-মায়ের অত্যন্ত আদরের। এ পৃথিবীতে সংগ্রাম ছাড়া তার আর কেউ রইল না। সংগ্রামই তার একমাত্র অবলম্বন। যে করেই হোক তাকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। সংগ্রামকে দিয়ে তাদের মনের ইচ্ছার বাস্তবায়ন করতেই হবে। এছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

আশালতা মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী এই গর্বে গর্বিত। অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পর সে এখন সাবলম্বী। সততা, নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম করে সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সংগ্রামও এখন বড়ো হয়েছে। মাকে ছাড়া সংগ্রাম কিছুই বোঝে না। মা বলতে অজ্ঞান। তার কাছে মা-ই সব। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। মন দিয়ে লেখাপড়া করে। স্কুলের সবাই সংগ্রামকে ভালোবাসে। সংগ্রাম বাবা সম্পর্কে তার মায়ের কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। আশালতা উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যায়। ছেলের এত প্রশ্ন এত জানার আগ্রহ তা বলে শেষ করার নয়। সংগ্রামের একটাই কষ্ট তার বাবা নেই। অবসর সময়ে বাবাই ছিল তার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। বাবা কোথায় গেছে? কবে গেছে? কীসের জন্য গেছে? যুদ্ধে কেন গেছে? কার সঙ্গে যুদ্ধ? যুদ্ধ তো শেষ তবে বাবা আসছে না কেন? এ রকম হাজার কথার উত্তর আশা গল্পের মতো করে সংগ্রামকে বুঝিয়ে বলে। সংগ্রামও মুগ্ধ হয়ে শোনে। আশালতা বলে বাবা এগুলো গল্প নয়, এগুলো ইতিহাস। তুমি বড়ো হয়ে সব বুঝতে পারবে। আরো বেশি বেশি জানতে পারবে। এই ইতিহাস একদিনে বলে শেষ করা যাবে না। এছাড়া এমন অনেক কিছু আছে যা তুমি এখন বুঝতে পারবে না।

ধীরে ধীরে সংগ্রাম বড়ো হয়ে ওঠে। সহপাঠীদের সাথে বন্ধুত্ব হয়। মেলামেশা বাড়ে। সবার সাথে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়। সংগ্রাম খুব ভলো ছাত্র। ক্লাসে সব সময় ভালো রেজাল্ট করে। তাতে সবার নজর কাড়ে। স্কুলের সহপাঠী ছাড়া আর কারো সাথে তার বন্ধুত্ব নেই। প্রতি বছরই নিয়মিত উপস্থিতির জন্য পুরস্কার পায়। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে বই পড়া, আবৃত্তি করা, ছবি আঁকা, গান শোনার অভ্যাস তার বিশেষ গুণ। সে প্রতিটি বিষয়ে খুব সিরিয়াস। কোনো কিছুকে খাটো করে দেখার অভ্যাস তার নেই। সব কাজ আপন মনে করে। এর জন্য কোনো তাগিদের অপেক্ষা করে না। সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আগ্রহী। সংগ্রাম পড়ালেখায় যেমন ভালো কাজেকর্মেও তেমনই পারদর্শী। কোনো অলসতা নেই। উচ্ছল প্রাণবন্ত সুন্দর মনের একটা ছেলে। আচার ব্যবহার তার বাবা-মায়ের মতো। বিশেষ দিবসগুলোর বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেয়। বিশেষ করে বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি, রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী ইত্যাদি। এসব দিবস পালনে তার উৎসাহ উদ্দীপনার যেন শেষ নেই। বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটো দিবসের সাথে জড়িয়ে রয়েছে তার বাবার আত্মত্যাগ। বেশি করে মনে পড়ে বাবাকে। তাই এই দিবসগুলো তার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার মায়ের কাছে অজানা অনেক কথা জানতে পারে। মায়ের মুখে কথাগুলো শুনতে শুনতে সংগ্রাম কোথায় যেন হারিয়ে যায়। কল্পনায় বাবার প্রতিটি ঘটনা মনের ভেতর আঁকে। আশার কাছে লোকমানের ছবি দেখে সেই ছবিখানা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে বাবার স্পর্শ পায়। তার একটা বিশেষ গুণ মায়ের কথা মেনে চলা। মা যেভাবে বলবে সে সেই ভাবেই চলবে। যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন মাকে কোনো ভাবেই চোখের আড়াল করতে চায় না। সে তার মায়ের মধ্যে বাবাকে দেখতে পায়। মায়ের মুখে বাবার ইচ্ছার কথা শোনার পর বাবার ইচ্ছা পূরণের জন্য সে সংকল্পবদ্ধ। সে একদিন না একদিন বাবার স্বপ্ন পূরণ করবেই করবে।

দেখতে দেখতে শৈশব পেরিয়ে কৈশোর তারপর কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা রাখে সংগ্রাম। সে এখন টগবগে তরুণ। তারুণ্যের স্বর্ণচূড়ায় অবস্থান

করছে। একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সততা আর আদর্শকে কাজে লাগিয়ে সৌভাগ্যের সোনালি সিঁড়িতে পৌঁছে গেছে। এখন তার সময় এসে গেছে। ফেলে আসা জীবনের সবকিছুকে অবলম্বন করে সে এক নতুন জীবনে পা রাখতে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারে বিশাল এই পৃথিবীতে কোনো ভালো কিছু অর্জন করতে হলে একাগ্রতা নিষ্ঠা আর সততা ছাড়া টিকে থাকা যাবে না। তাই চড়াই উতরাই পার করে সে সমাজে সুন্দর একটা জায়গা করে নিয়েছে। বিত্তবান হওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই। সে চায় যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের মূল্যায়ন হোক। দেশের কল্যাণ হোক। দেশের মানুষ ভালো থাকুক। যে দেশের জন্য তার বাবা আত্মত্যাগ করেছে সেই দেশ কখনো অসুন্দর থাকতে পারে না। তাই দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করে স্কলারশীপ নিয়ে যুক্তরাজ্য থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফিরে আসে। তার ইচ্ছা দেশের অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়াবে। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করবে। সে একমুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চায় না। তাই নিজেকে রীতিমতো কাজকর্মের মধ্যে ব্যস্ত রাখে। সংগ্রামের ব্যস্ততা দেখে তার মা তাকে বিশ্রাম নিতে বলে। আশালতা বলে আমি তো এখনো বেঁচে আছি বাবা। এত পরিশ্রম করে শরীরটা নষ্ট করো না। সংগ্রাম মাকে বলে, দেখো মা তুমি সারাজীবন কষ্ট করেছ। বাবার অভাব পর্যন্ত আমাকে বুঝতে দাওনি। বাবার অবর্তমানে বাবার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কত পরিশ্রম কত কষ্টই না করতে হয়েছে তোমাকে। আমার গায়ে একটা টোকাও লাগতে দাওনি। কী অসাধারণ মা তুমি আমার। আমার কাছে তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা। আমি তোমাকে আর কষ্ট করতে দেবো না। এই কথা শোনার পর আশালতার দু'চোখে আনন্দে জল আসে। মুহূর্তে লোকমানের কথা মনে পড়ে। আশালতা মনে মনে ভাবে আর বলে আজ যদি লোকমান বেঁচে থাকত তাহলে দুজনে এক সাথে এই আনন্দটা ভাগ করে নিতাম। মায়ের চোখে জল দেখে সংগ্রাম মাকে বুকে জড়িয়ে বলে মা তোমার কী হয়েছে? তুমি কাঁদছ কেন? আশালতা বলে ও কিছু না বাবা। আমি কাঁদব কেন, আজ যে আমার সুখের দিন। আমার চোখের জল তো আনন্দের। আমার ছেলে বড়ো হয়েছে। মায়ের মনের কথা বুঝতে শিখেছে। আমার আবার দুঃখ কীসের। এখন তো আমার সুখের দিন। জানিস বাবা আমার ভাবতে অবাক লাগে এই তো সেদিন তুই এলি। পৃথিবীর আলোর মুখ দেখলি। আমি আর তোর বাবা তোকে নিয়ে কত আনন্দ কত হইচই-ই না করেছি। তুই আসার পর আমাদের ব্যস্ততা অনেক বেড়ে যায়। তোর জন্য তোর বাবা রাত জেগে পাহারা দিত। তোর ভেজা কাঁথা পালটে দিত। তোর শরীরে আমাদের হাত চাপা পড়ে কিনা তার জন্য সজাগ থাকত। তোকে নিয়ে যেন আমাদের আদিখ্যেতার শেষ নেই। মায়ের মুখে এসব শুনে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। মনের পাতায় ছবি আঁকতে গিয়ে কখন যে তার চোখেও জল আসে তা সে নিজেও জানে না।

আশালতার কাছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অনেক কথাই সংগ্রাম জানতে চায়। আশালতা সংগ্রামকে একে একে অনেক কথাই বলে, তারপরও কথার শেষ বলে কিছু নেই। আশা বলে আজ আমার কোনো দুঃখ নেই। বাংলার দামাল ছেলেরা পাক সেনাদের পরাজিত করে বিজয় এনেছে। স্বাধীনতা এনেছে। ফিরে এসেছে বাঙালির অহংকার। বাঙালির গর্ব জাতির দিশারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতি গঠনে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সোনার বাংলা। আশালতা সংগ্রামের কাছে বাঙালির ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে বলে, দেখো যে জাতি ভাষার জন্য প্রাণ দিতে পারে, যে জাতি স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারে, সে জাতি কখনো পিছিয়ে থাকতে পারে না। দেখবে তুমিও পিছিয়ে থাকবে না। মনে রেখো তোমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। তুমি তার সন্তান। তোমার শরীরে তারই রক্ত বইছে। তাই তোমার উন্নতি তোমার অগ্রগতি কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আমি তোমার বাবার আদর্শে তোমাকে মানুষ করেছি। তুমি তোমার সততা

আর বিশ্বাস সেই সাথে নিষ্ঠাকে দেশের কাজে লাগাও। দেখবে তোমার সাফল্য আসবেই আসবে।

তুমি তো জানো না বাবা যুদ্ধকালীন নয়টি মাস আমাকে কত কষ্ট করতে হয়েছে। কত প্রতিকূল বৈরী পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমি আমার স্বামী হারালাম। হারালাম বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি সবাইকে। আপনজন বলতে তুমি ছাড়া তো আর কেউ রইল না। কই আমি তো কখনো হিসেব করে দেখিনি। কী পেলাম আর কী পেলাম না। সব হারিয়েও আমি গর্ব অনুভব করি। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের দেশ বর্বর হায়েনা নরপিশাচ মুক্ত হোক। দেশটা স্বাধীন হোক। আমাদের সন্তান বেঁচে থাক। বড়ো হয়ে যেন দেশের জন্য কিছু করতে পারে। যাতে দেশের কল্যাণ হয়। আজ আমার সেই সময় এসেছে। সময় এসেছে কিছু করার। এখনো আমার মনে পড়ে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের কথা। প্রতিটি শব্দ প্রতিটি উচ্চারণ আজও আমার উপলব্ধিতে নাড়া দেয়। আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে। তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই দেশ একদিন না একদিন স্বাধীন হবেই হবে। তোর বাবা সেই ভাষণের একজন প্রত্যক্ষ দর্শক শ্রোতা। প্রত্যক্ষ একজন সাক্ষী। সেই দিনের পর থেকেই তোর বাবা মনের মধ্যে পুষে রেখেছিল তার চলে যাওয়ার বিষয়টি। কাউকে বুঝতে দেয়নি। এমনকি আমাকেও না। লোকমান বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আজ আমি বুঝতে পারি সে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেয়নি। এখানেই আমার গর্ব হয় আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী। আমার সংগ্রাম একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। আমি কী পেলাম আর কী পেলাম না তাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। আমি যে একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী এই পরিচয়ে বাঁচতে পারাই আমার অহংকার। তোমার বাবার কাছে যেমন দেশ বড়ো ছিল, আমার কাছেও তেমন আমার সন্তান আর আমার দেশ বড়ো। আমরা চাই ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ আর দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা চিরকাল উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হোক, ঘরে ঘরে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হোক, দেশের কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক। প্রতিটি মানুষ সুখে থাক, ভালো থাক। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক ও বাংলাদেশ বেতারের সাবেক কর্মকর্তা

বিজয়ের কবিতাগুচ্ছ

ধন্য মাগো ধন্য

শাফিকুর রাহী

মহৎ মহান মনীষী এক স্বপ্ন সাধনায়
স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখান শ্যামল সোনার গাঁয়।
মধুমতির কাজল জলে দুরন্ত শৈশবে
দুঃসাহসী বীরের প্রভায় তিমির তাড়ায় সবে।
স্বাধীনতার সূর্য তাপস আলোর পারাবারে-
দীপ্ত শিখায় আওয়াজ তোলে গভীর অন্ধকারে।

বীর বাঙালির বীরত্বেরই স্বপ্ননায়ের মাঝি
বাংলা মায়ের মুক্তির দূত জীবন দিতে রাজি।
অধিকার আদায়ের যুদ্ধে পড়তে গলায় ফাঁসি-
যার ভাষণে বিস্মিত হয় সারা বিশ্ববাসী।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্য
স্বাধীন স্বদেশ পেলাম আমরা ধন্য মাগো ধন্য।

আজকে মোরা বিশ্ব জুড়ে গর্বিত এক জাতি
বাংলা মায়ের বীর গেরিলা ভাঙল আঁধার রাতি।
আকাশ-বাতাস উঠল নেচে শোকের দাহ ভুলে
শ্রদ্ধা জানায় বীর জনতা লক্ষ গোলাপ ফুলে।
তোমার স্মৃতিসৌধ ঘিরে আনন্দ আবেগে
জয়বাংলা স্লোগানে উঠল সবে জেগে।

মুজিব ছাড়া এই বাংলা ভুলেও ভাবা যায়;
ভাটিয়ালি বাজে আজও স্বপ্ন সোনার নায়।
বীর বাঙালির জয় গরিমায় আল্লাহ মেহেরবান
রহমতের ঝর্ণাধারায় হাসল যে আসমান।
বঙ্গবন্ধুর আজকে শত-শুভ জন্মদিন
তাঁরই কাছে বাংলা মায়ের চিরকালের ঋণ।

বিজয় পেয়ে

গোলাম নবী পান্না

দূরের সে পথ পেরিয়ে এসে
হাঁপিয়ে ওঠা,
পথ ফুরালে আনন্দ তাই
দৌড়ে ছোটা।

দেশের টানে যুদ্ধে নেমে
মরণ জোটা,
বিজয় পেয়ে সবার ঠোঁটে
হাসি ফোটা।

যায় মুছে যায় দেশ থেকে ঐ
অধীন-খোঁটা,
স্বাধীনতার আলোয় জাগে
ফুলের বোঁটা।

আমার ঠিকানা

মিয়াজান কবীর

বুনোলতা তুলতে গিয়ে
যদি আমি যাই হারিয়ে
গহিন অরণ্য মাঝে,
বলব কথা পাখির সনে
পথের রেখা খুঁজব মনে
তারা ভরা আকাশে।
যদি বনের শুয়াপাখি
কিচিরমিচির করে ডাকি
শুধায় পথের নমুনা,
বলব আমি বাংলা ভাষায়
পথহারা পথ পাবার আশায়
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা।

পতাকা

মো. মাসুদুর রহমান

লাল-সবুজ পতাকা
আমার দেশের মান
শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি
দিয়েছ যারা জান।

তোমরা সবাই অমর হয়ে
আছো সবার মাঝে
ভাবতে আমার ভালো লাগে
সকাল-দুপুর-সাঁঝে।

পতপত করে উড়ছে আজ
মুক্ত স্বাধীন আকাশে
গর্বের সাথে উড়ে চলেছে
স্বাধীন বাংলার বাতাসে।

একাদশ শ্রেণি, নিউ ডিগ্রি সরকারি কলেজ, রাজশাহী

বীর বাঙালির বিজয়

কামাল হোসাইন

নতুন একটা সূর্য এবং
নতুন পতাকায়
বাংলা হাসে ঝিলমিলিয়ে
নতুন ঠিকানায়।

গাইছে পাখি আনন্দে গান
বাইছে মাঝি নাও
বৈঠা হাতে তুলছে তুফান
যাচ্ছে দূরের গাঁও।

দিঘির জলে শাপলা ফুটে
হাসছে বুঝি খুব
পানকৌড়ি খোশমেজাজে
খেলছে সাঁতার-ডুব।

বাগান জুড়ে প্রজাপতি
জুড়ল হুলুস্থুল
ফোটার নেশায় ব্যাকুল বেজায়
রঙিন যত ফুল।

ফুল ফোটে হয় সুবাসিত
মৌ মৌ মৌ পাড়া
আজকে বুঝি এক খুশিতে
সবাই দিশেহারা।

দীর্ঘ নমাস যুদ্ধে পেলাম
দেশটা নিজের করে
লাল-সবুজের ঝান্ডা ওড়ে
বীর বাঙালির ঘরে।

বিজয় মানে

মুহাম্মদ ইসমাঈল

বিজয় মানে সাহস নিয়ে এগিয়ে যাওয়া
বিজয় মানে রক্তিম মাখা সূর্য দেখা
বিজয় মানে একটি কুঁড়ি একটি গোলাপ ফুল
বিজয় মানে ছন্দ তোলা ডাকাতিয়া নদের কূল।
বিজয় মানে কৃষাণ ভায়ের মুক্তঝরা হাসি,
বিজয় মানে রাখাল ছেলের মন মাতানো বাঁশি।
বিজয় মানে গ্রাম্য ছেলের দস্যিপনার সাথি,
বিজয় মানে বিজন রাতের জোনাক জলা বাতি।
বিজয় মানে মায়ের ভাষায় গল্প-কাব্য বলা,
বিজয় মানে স্বাধীনভাবে একলা পথে চলা।
বিজয় মানে বজ্রকণ্ঠে শিকল ভাঙার গান,
বিজয় মানে একটি যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ প্রাণ।
বিজয় মানে লাল-সবুজের নতুন একটি দেশ,
বিজয় মানে দৃপ্ত কণ্ঠে শাবাশ বাংলাদেশ ॥

বিজয়ের আনন্দ

নুসরাত জাহান

আজ এই বিজয়ের আনন্দে মনে আসে তৃপ্তি
তাই তো ক্ষণিকের তরে ভুলে যাই অতীতের
সব দুঃখ, বেদনা, গ্লানি।

সত্যিই আমরা ধন্য এই বীরের দেশে জন্মে
যে দেশে আছে লাখো শহিদের রক্তে জড়ানো
আর লাখো মা-বোনের অশ্রুভেজা স্মৃতি।

যেখানে বিজয়ের গান ভেসে আসে ভোরের বাতাসে
যেখানে আছে চারিদিকে ছড়ানো ছিটানো
হাজারো নদী আর পাখির কলতান।

যেখানে আছে হাজারো বাউল আর লালনের স্মৃতি
যখন দেখি এই সোনার দেশে সবার মুখে হাসি।
তাই তো আমরা এই বিজয়ের আনন্দে
মাতৃভূমি দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি।

বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ

সাঈদ তপু

বঙ্গবন্ধু মানেই সোনার বাংলাদেশ
যে ঠিকানায় পাখিরা হয় নিরুদ্দেশ
যাঁর আলোতে হারিয়ে যায়, আঁধার ঘোর
বঙ্গবন্ধু মানেই সকাল, নতুন ভোর
চিকমিকে রোদ মাখছে গায়ে আমের বোল
মাঠে মাঠে নবীন ধানের মিষ্টি দোল
নদীর ভেতর সাগর যেমন মেশানো
মাটির গায়ে পাহাড়টা ওই ঘেঁষানো
মেঘের দেহে বৃষ্টি আঁকে যেমন করে আল্পনা
বঙ্গবন্ধুর দেহ কোষেও লাল-সবুজের জাল বোনা।

বিজয়ের ফুল

রকিবুল ইসলাম

বিজয়ে ফুল ফোটে বিজয়ের ফুল
চারিদিকে মৌ মৌ আহা কি ব্যাকুল!
প্রজাপতি নাচে আর পাখি সব গায়
নাচে-গানে মাতে আর খুশিতে হারায়।

বিজয়ের সুর বাজে বিজয়ের সুর
সুরে সুরে ভেসে যাই আহা কী মধুর!
বাঁশি বাজে আর বাজে তাক দুমাদুম
এত সুর এত গান টুটে যায় ঘুম।

বিজয়ের মেঘ ভাসে বিজয়ের নীল
লাল আর সবুজের আহা কী যে মিল!
রংধনু সাত রং রোদেলা রঙিন
বিজয়ের বৃষ্টিতে ভিজে সারাদিন।

বিজয়ের নদী ছোটে জল কলাকল
ঢেউ হয়ে ভেসে যায় সাগর অতল।
এলোমেলো বাতাসের রোদমাখা দিন
বিজয়ের দিন যেন মায়া জাদুবীণ।

অন্যরকম মুক্তিযুদ্ধ

রফিকুর রশীদ

তিন রুমের একচিলতে বাসার মধ্যে বন্দি থাকতে থাকতে পিকলু যখন সত্যি সত্যি হাঁপিয়ে ওঠে, তখনই একদিন ওর আম্মু সুসংবাদটা জানায়– দু-চারদিনের মধ্যে ওরা সবাই কুসুমপুরে চলে যাবে। পিকলুর আম্মুর আবার এ নিয়ে সাবধানতার অন্ত নেই। আব্বু অফিসের জন্য বেরিয়ে যাবার পর সারাদিন বন্ধ থাকে ঘরদোর। তবুও সতর্ক চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলার স্বর নামিয়ে জানতে চায়, পথে খুব কষ্ট হবে কিন্তু। পারবি তো যেতে? সে অনেক দূর।

খবরটা শোনার পর থেকে আনন্দে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল পিকলু। এবার সে লাফিয়ে ওঠে, পারব না মানে! কীসের কষ্ট?

মুখে আঙুল চেপে থামিয়ে দেয় আম্মু, চুপ! চুপ! আস্তে।

মন খারাপ হয়ে যায় পিকলুর। ভেবে পায় না এত সাবধানতা কীসের! কতদিন পরে তারা যাচ্ছে নানাবাড়ি, সে কথা এমন ফিসফিসিয়ে বলারই বা কী দরকার! কী হবে সবাই শুনলে? ওর আম্মু স্পষ্ট নির্দেশ জারি করে- আমরা যে চলে যাচ্ছি, কাউকে বলবি না যেন!

পিকলু ঘাড় নিচু করে চলে আসে বিছানার কাছে। বেশ নির্বিবাদে শুয়ে আছে ছোটো বোন পিংকি। কোনো ভাবনাচিন্তা নেই। আম্মুর নিষেধাজ্ঞা মানতে ইচ্ছে করে না মোটেই। পিংকির তুলতুলে গালে টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিরে পিচ্চি, যাবি নানাবাড়ি?

আম্মু আবার চোখ কটমট করে তাকায়। ভ্রুক্ষেপ নেই পিংকির। সে কেবল ফোকলা মুখে মিটমিটিয়ে হাসে। পিকলু মজা পায়। একবার রাগও হয়– ওই পিচ্চি ছাড়া কাকে বলবে সে! কে আছে এখানে?

এই ফ্ল্যাটের অবশিষ্ট তিনটি ফ্যামিলির মধ্যে হাসানরাও নেই, মুকুলরাও নেই। নিচতলা একদম ফাঁকা। আছে কেবল সিঁড়ির ওপাশে মুস্তাফিজুরদের ফ্যামিলি। ওদের সঙ্গে তো আজ কদিন একেবারেই চলাচল বন্ধ। তারপরও আম্মুর এত বেশি কড়াকড়ি আসে কোত্থেকে! স্কুল বন্ধ। ঘরের মধ্যে বন্দি। কথা সে বলবে কার সাথে?

সন্ধ্যার পর আব্বু বাসায় ফিরলে পিকলু তার চারপাশে ঘুরঘুর করে। নানাবাড়ি যাবার বিষয়টি সে নিশ্চিত হতে চায়। এর আগেও আম্মুকে কুসুমপুরে যাবার কথা বলতে শুনেছে। আব্বু কিছুতেই রাজি হয় না, সে খুব জানে। অফিসের চাপ তো আছেই, এদিকে কুসুমপুরের নানান সমস্যা - বিদ্যুৎ নেই, ধুলোবালির একশেষ, গুমোট গরম, এমনই আরো কত কী! এই তো সেদিন মন্টুমামা কত করে বলল, কিছুতেই কাজ হলো না। এবার সত্যি রাজি হয়ে গেল আব্বু! বিশ্বাস হতে চায় না। আম্মুকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে পিকলু ফিসফিস করে জানতে চায়–

আব্বু, আমরা নানাবাড়ি যাচ্ছি কবে?

চোখ গোল করে তাকায় আব্বু।

নানাবাড়ি! কে যাবে সেখানে?

কেন, আমরা সবাই যাব।

তার মানে খবর আউট হয়ে গেছে?

ঘাড় কাৎ করে হেসে ওঠে পিকলু। আম্মুকে এগিয়ে আসতে দেখে সেই হাসির লাগাম টেনে সে চুপচাপ উঠে আসে।

অবশেষে সত্যি একদিন খুব সকালে পিকলুরা সবাই মিলে রওনা দেয় কুসুমপুরের উদ্দেশ্যে। আগের রাতে এটা সেটা বাঁধা নিয়ে আব্বু-আম্মুর ব্যস্ততা দেখে পিকলুর ভয়ানক হাসি পেয়েছিল। এটা নেওয়া হয় তো ওটা বাদ যায়, ওটা নিলে সেটা এড়িয়ে যায়। থরে থরে সাজানো সুটকেসের কাপড়চোপড় সাতবার নামায়, আবার গোছায়। আব্বুর কড়া নির্দেশ বেশি কিছু নিয়ে বোঝা বাড়ানো যাবে না। পথে অসুবিধা হবে। আম্মুও কম যায় না। গজগজ করে বলে, হ্যাঁ, তোমাকে ধরার জন্যেই তো সারা পথে মিলিটারি বসে আছে! তোমাকে না পেলে তো ওদের চলছে না!

আমাকে নয়, ওরা তোমাকেই ধরবে। বুঝলে? বাইরের খবর তো জানো না কিছু, ঘরের মধ্যে বসে টেরও পাও না সে সব। পথে নেমে পা বাড়িয়ে দেখো!

পিকলু বুঝতে পারে না, সারা দেশে এসব হচ্ছেটা কী! স্কুল বন্ধ। বাইরেও যাওয়া যাবে না। পাশের ফ্ল্যাটে গুলি হলো। একদিনে, মানে এক লহমায় মারা গেল পাঁচজন। মানুষের জীবনের কি দাম নেই! মন্টুমামা সেইদিনই ওদের বাসা থেকে উধাও। তার কথা কারো কাছে আবার বলাও যাবে না। মুস্তাফিজুরের আব্বা নাকি মন্টুমামাকে সন্দেহ করে। কীসের সন্দেহ তাও বোঝে না পিকলু। কিন্তু তারপর থেকে মুস্তাফিজুরদের সঙ্গে মেলামেশাটা ধীরে ধীরে কমে আসে। মিলিটারির ভয়ে সবাই জড়োসড়ো। কিন্তু মুস্তাফিজুরের আব্বা নাকি মোটেই ভয় করে না। নিচতলা থেকে হাসান এবং মুকুলদের ফ্যামিলি চলে যাবার পর পিকলুর আব্বুকে একদিন অভয় দিয়েছিল– কোথাও যাবার দরকার নেই আপনাদের। ভয় কীসের, আমি তো আছি!

এই অভয়বাণী শোনার পরই পিকলুর আব্বু কুসুমপুরে যাবার সিদ্ধান্ত ফাইনাল করে ফেলে। তার মন বলে– আর নয়।

কিন্তু দীর্ঘদিন পর নানাবাড়ি যাবার সংবাদে পিকলু যে রকম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, পথে নামার পর তার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। সারা রাত ধরে ঝগড়াঝাঁটি করে বোঝা কমিয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যাগ–সুটকেস মিলিয়ে গোটা তিনেক বেহাতি দাঁড়িয়ে যায়। আর ওই এক বছরের পিচ্চিকে যেহেতু কিছুতেই আম্মুর কোল থেকে নামানোর উপায় নেই, কাজেই বোঝার সংখ্যা চারই বলা চলে। পিকলু অবশ্য নিজেকে কখনোই বোঝা করে তুলতে চায়নি। বরং সে কাঁধে ওয়াটারপট ঝুলিয়ে টিফিন ক্যারিয়ার

আগলে রেখে সাধ্যমতো সহযোগিতাই করেছে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! একটানা দু-দিন চলার পরও পথ যে কিছুতেই ফুরাতে চায় না। দূর মানে কি সত্যিই এত দূর!

ট্রেন থেকে ঈশ্বরদী নামার পর আর বাস পাওয়া গেল না। জানা গেল – এ অঞ্চলে বাস চলছে খুবই অনিয়মিত। সকালে আবার বাস পাওয়া যেতে পারে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যমদূতের মতো তিনজন বিহারি এসে ওদের ব্যাগ- সুটকেস হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নেয়। স্টেশনে মিলিটারি দেখে খুব ভয় পেয়েছিল পিকলু। কিন্তু এখন চোখ গোল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে– ওর আম্মুর গলা থেকে একটানে এরা ছিঁড়ে নেয় সোনার চেইন। পিংকি আবারও চিৎকার করে ওঠে।

পিকলু চিৎকার করতে পারে না, তবে আব্বুর দিকে তাকিয়ে ভীষণ কান্না পায়।

একটা দোকানের চালার তলে সারারাত কাটিয়ে সকালের বাস পেতে পেতে বেলা দশটা বেজে যায়। প্রচণ্ড ভিড়। বাসে ওঠাই দায়। এদিকে গতরাত থেকে পিংকির জ্বর, সঙ্গে বমি। গা পুড়ে যাচ্ছে। পিকলুরও সারা শরীরে ব্যথা। তবু কুসুমপুরে যেতে হবে। নানাবাড়ির স্বপ্ন এখন দুঃস্বপ্ন হয়ে ঝুলছে তার চোখে। বাস থেকে নেমে আবার পায়ে হাঁটা পথ।

পড়ন্ত বেলায় সেই পায়ে হাঁটা পথে পা ফেলেই দাঁড়িয়ে পড়ে পিকলুর আব্বু। বছর দুয়েক আগে পিকলুর ছোটো খালার বিয়ে উপলক্ষ্যে যখন এসেছিল, তখন শ্বশুরের পাঠানো ছইতোলায় গরুর গাড়ি ছিল তাদের অপেক্ষায়। বিয়ের পর যতবার এসেছে কুসুমপুরে, এই পথটুকুর জন্য এ বন্দোবস্ত বরাবরই থেকেছে। কিন্তু এবার এই পথ কীভাবে পাড়ি দেবে ভেবে পায় না। বটতলায় পিকলুদের বসিয়ে রেখে সে এদিকে সেদিকে ছোটাছুটি করে। গাড়ি-ঘোড়ার কোনো কিনারা হয় না। বাসের যাত্রী আরো দু-চার জন নেমেছিল বটতলা স্টপেজে, তারা অনেক আগেই হাঁটতে শুরু

করেছে। একজন উৎসাহী হয়ে জানতে চেয়েছিল তারা কোথায় যাবে। কিন্তু জবাব শোনার পর সেও দাঁড়ায়নি। যাবার আগে পরামর্শ দিয়েছে, হাতে যখন বেহাতি নেই, হাঁটতে শুরু করেন। সন্ধ্যা লেগে যাবে যে!

পিকলুর আব্বু ফিরে এসে সেই কথাই বলে, ব্যাগ-ব্যাগেজ কেড়ে নিয়ে ওরা ভালোই করেছে। নাও, সবাই পা চালাও।

এ সময়ে হঠাৎ ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদে ওঠে পিংকি। ওকে তো এক পাও হাঁটতে হবে না। তবু যেন এ সিদ্ধান্ত মোটেই পছন্দ হয় না ওর। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে পিকলু প্রস্তাব দেয়–

হাঁটতে শুরু করব আব্বু?

তুই সত্যিই হাঁটতে পারবি?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় পিকলু, হ্যাঁ।

তারপর আব্বুর হাতের আঙুল ধরে আবদার জানায়– আমাকেও একবার কোলে নিতে হবে কিন্তু।

মুখে বলে বটে, তবু কোলে ওঠার জন্য সে মোটেই দাঁড়ায় না। সবার আগে আগে হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে পিকলু কখনো সামনে চলে যায়, কখনো পিছিয়ে পড়ে। পিছন থেকে চিৎকার করে পিংকিকে পিচ্চি বলে ডাকে, জাগিয়ে রাখতে চায়। হঠাৎ কোথা থেকে যেন হারানো উৎসাহ খুঁজে পায়। কাছাকাছি ছুটে এসে নানার কথা, বড়োমামার কথা জিজ্ঞেস করে। কথায় কথায় মন্টুমামাকেও মনে পড়ে যায়, তখন শুধায় – মন্টুমামাকে তো বাড়িতেই পাওয়া যাবে, তাই না আম্মু?

পিকলুর এই স্বতঃস্ফূর্ত চঞ্চলতা ভালোই লাগে ওর আব্বু-আম্মুর। ক্লান্তিতে তাদের হাত-পা ভেঙে আসছে। আম্মুর পায়ে ফোসকা ওঠায় এরই মাঝে স্যান্ডেল হাতে নিতে হয়েছে। পিংকি কোল বদল করে এই ফাঁকে উঠেছে আব্বুর কোলে। তা নিয়েও পিকলুর কোনো হিংসা নেই। আহা, বেচারা জানেই না – নানাবাড়ি এখনো কত দূরে। এই উদ্যম আর কতক্ষণ থাকবে কে জানে!

হঠাৎ পিকলুর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে হোঁচট লেগে এক রাশ পথের ধুলো ছিটকে পড়ে। হোঁচটের ধাক্কা সামলাতে পারে না। ধুলোবালির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় পিকলু। প্রাণপণ চিৎকার করে ওঠে-আম্মু! দৌড়ে গিয়ে পিকলুকে কোলে তুলে নেয় ওর আব্বু। কিন্তু পিকলুর তখন দু-চোখে ঘন অন্ধকার। চিৎকার করে কাঁদছে, চোখের মধ্যে ধুলো পড়েছে। চোখ জ্বালা করছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

এরপর দীর্ঘক্ষণ পানির ঝাপটা দিয়ে চোখ কিছুটা পরিষ্কার হয়ে এলেও বাকি পথ আর হেঁটে যাবার উদ্যম পায় না পিকলু। নাকমুখ মুছতে মুছতে চেপে বসে আব্বুর কোলে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর পর পিকলুরা যখন বিধ্বস্ত অবস্থায় নানাবাড়িতে পৌঁছে, তখন সারা বাড়ি নিঝুম নিস্তব্ধ। যেনবা এ বাড়িতে রাত নেমে এসেছে অনেক আগেই। দীর্ঘ দু-বছর পর বড়ো মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনি এসেছে। তবু কারো চোখেমুখে উচ্ছ্বাস নেই। এসব দেখেশুনে পিকলু খুব মন খারাপ করে। একটু পরে সে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। এই কান্না সবার মনের বাঁধ ভেঙে দেয়। পিকলুর নানি তার বড়ো মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ শুরু করে। পিংকিও অবিলম্বে যোগ দেয় এই কান্নাপ্রবাহে।

প্রাথমিক আবেগ সংহত হয়ে এলে জানা গেল, যশোরের মনিরামপুর থেকে খবর এসেছে, পিকলুর ছোটো খালাকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেছে। খালুও তখন থেকে নিরুদ্দেশ। খবর শুনে এ বাড়ির সবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। সেই মনিরামপুরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে পিকলুর বড়ো মামা। এরই মাঝে পিকলুরা এসে হাজির।

এদিকে মন্টুমামাও বাড়ি নেই। প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে চায় না। কিন্তু বড়ো মামার মেয়ে পারুল সব জানিয়েছে পিকলুকে। খুব গোপনে আর সাবধানে,

কাউকে না বলার শর্তে জানিয়েছে - মন্টুমামা যুদ্ধে গেছে। পিকলুদের বাসা থেকে চলে আসার পর গ্রামের বন্ধুদের ডেকে সংগঠিত করে, তারপর সবাই মিলে ভারতে চলে যায় ট্রেনিং নিতে। যুদ্ধে যাবার ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট করে বোঝে না পিকলু। তবু পারুলের কাছে খবরটা শুনে তার বেশ ভালো লাগে। মনের আকাশ থেকে কালো মেঘ কেটে যায় ধীরে ধীরে। ভেতরে ভেতরে সাহস আর আনন্দ খুঁজে পায়। একদিন খুব সতর্ক ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলে– মন্টুমামার খবর জানো আম্মু?

মন্টু?

প্রথমে চমকে ওঠে পিকলুর আম্মু। যেন কোন মন্টু সেটা নির্ণয় করতেই সময় লাগে। তারপর ছেলের মুখে হাত চাপা দেয়। তবু পিকলু প্রশ্ন করে–

মন্টুমামা কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে আম্মু, বিহরিদের সঙ্গে?

আহ্ থাম তো! কে বলেছে এসব কথা?

চাপা কণ্ঠে ধমকানি দেয় পিকলুর আম্মু। তবু কৌতূহল মেটে না পিকলুর, বলো না আম্মু– কার সঙ্গে যুদ্ধ, মিলিটারির সঙ্গে?

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় পিকলুর আম্মুর। ঠাস করে একটা চড় কষে ছেলের মুখ বন্ধ করে দেয়। পিকলু খানিক গাল ফোলায়, চোখ কচলায়, তারপর চলে যায় পারুলের সঙ্গে খেলতে। খেলা বলতে উঠোনের আমতলায় ধুলোবালি নিয়ে মিছামিছি রান্নাবান্না খেলা, অথবা বারান্দার কোনায় বসে পুতুল নিয়ে ঘর সাজানোর খেলা, উঠোনের ধুলো ঘরে তুলে একাকার।

এই নিয়েই ওরা মেতে আছে আজ কদিন। এই খেলাতেই যেন কত আনন্দ।

এরই মাঝে একদিন মিলিটারি আসে কুসুমপুরে। রাতের আঁধারে নয়, প্রকাশ্যে দিবালোকে। ওদের আগমনের ধরনই আলাদা। গ্রামের শুরুতেই পর পর গোটা দশেক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল, রাইফেলের গুলিতে লাশ ফেলে দিলো পাঁচ-সাতটা, তারপর লুটপাট করতে করতে চলল সামনে এগিয়ে।

পিকলু-পারুলরা সেদিন বারান্দার কোনায় খেলতে বসেছে। ওখানেই রান্নাবান্না, ওখানেই পুতুল-বিয়ে। বর-কনে উভয় পক্ষের একমাত্র নিমন্ত্রিত অতিথি পিকলুর নানা। বেশ জমেছে আনন্দের খেলা। কিন্তু হঠাৎ সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় মিলিটারি আসার কারণে। ঐ যমদূতেরা এসে পিকলুর নানাকে এবং আব্বুকে খুব নির্যাতন করে। শ্বশুর-জামাই কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারে না। মিলিটারিরা অতি দ্রুত উর্দু ভাষায় গটমটিয়ে কী সব উলটাপালটা প্রশ্ন করে দুজনকেই তালগোল পাকিয়ে দেয়। কেবল মন্টু শব্দটি ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারে না পিকলু। রাইফেলের বাটের আঘাতে ওর নানা গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। তখনই হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে পারুল। কিন্তু মিলিটারিরা সেদিকে না তাকিয়ে পিকলুর আব্বুকে ধরে নিয়ে যায় ওদের জলপাই রঙের গাড়িতে। পিকলু উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে ডেকে ওঠে – আব্বু!

আব্বু ফেরে না।

পিকলু তখনই দেখতে পায়– রান্নাঘর থেকে ওর আম্মুর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে আরেক পাষণ্ড মিলিটারি। পরনের কাপড় এলোমেলো লুটিয়ে পড়েছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করতে করতে, হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে বারান্দায় এসে আছড়ে পড়ে পিকলুর আম্মু। কিন্তু তাতেই কি সে রক্ষা পায়! চওড়া গোঁফওয়ালা লোকটি তখন জাপটে ধরে তাকে। আর দেরি না করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে পিকলু। একটুখানি পিছিয়ে এসে দু-হাতের আঁজলায় ধুলোবালি ভরে নিয়ে ক্ষীপ্রহাতে ছুড়ে দেয় লোকটির চোখেমুখে। বিকট শব্দে চিৎকার করে ওঠে লোকটি। দুচোখে তার ঘোর অন্ধকার। কাজেই তার হাতের বাঁধন আলগা হয়ে আসে। সেই সুযোগে পিকলুর আম্মু এক দৌড়ে ছুটে চলে যায় উঠোনের পশ্চিমে আমবাগানের দিকে। পারুলের হাত ধরে পিকলুও ছুটতে থাকে সেই দিকে। ■

লেখক: শিশুসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক

স্মারকে বিজয়

মো. শাহীন হোসাইন

আমাদের মহান বিজয় দিবস ১৬ই ডিসেম্বর। প্রতিটি বাঙালি হৃদয় দিয়ে অনুভব করে এ দিবসটিকে। বিজয়ের এই মাসে ব্যক্তি থেকে শুরু করে দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বিজয়ের উৎসবকে বর্ণিল সাজে উদযাপন করে। জাতীয় পতাকা বা দেশের প্রতীকের সঙ্গে মিলিয়ে অনেকেই সংগ্রহ করে বিজয়ের নানা স্মারক। বন্ধুরা, বিজয়ের নানা স্মারকের কথা তুলে ধরছি তোমাদের জন্য–

পতাকা: লাল-সবুজের পতাকায় রয়েছে সবার ভালোবাসা। আর ১৬ই ডিসেম্বর আসলে বেড়ে যায় এটির ব্যবহার। চাহিদা অনুযায়ী রয়েছে নানা আকারের পতাকা। দেশের পথেঘাটে এ সময়ে দেখা মিলে ভ্রাম্যমাণ পতাকা বিক্রেতাদের। এ সময়ে অনেকে বাড়ি কিংবা গাড়িতে ব্যবহার করে লাল-সবুজের এই পতাকাটি। নিজে ব্যবহারের পাশাপাশি অন্যকে দিয়ে থাকে অমূল্য এ স্মারক উপহারটি।

মগ: জাতীয় পতাকার রং কিংবা মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান সংবলিত নানারকমের মগ দেখা মিলে সবখানে। বিজয় দিবসে এটির কদর বেড়ে যায়। নিজে ব্যবহারের পাশপাশি প্রিয়জনকেও বিজয়ের উপহার হিসেবে দেওয়া হয় । চিনামাটির তৈরি এ মগগুলো দেখতেও খুব সুন্দর। এগুলো বিভিন্ন দামে নানা আকারের বিভিন্ন ফ্যাশন হাউস বা প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়।

এছাড়া নিউমার্কেট বা এলিফ্যান্ট রোডেও পাওয়া যায় নানান বাহারি মগ। দেশের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ পায় এ মগ স্মারকে।

বই: বই সবার প্রিয়। মহান মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে রয়েছে অসংখ্য বই। বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক বই প্রকাশ করে। বিজয়ের মাসে স্মারক হিসেবে এ বইগুলো হতে পারে ভালো উপহার। বন্ধুরা, বাবা-মাকে বলে কিনতে পারো বই। পড়ে জানতে পারবে দেশের মুক্তিযুদ্ধের নানা ঘটনা প্রবাহ। আরো পারবে কেমন করে পেলাম আমরা এ দেশটি। জানার পাশাপাশি সংগ্রহে থাকবে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বইটিও।

পোশাকে বিজয়: বিজয়ের এই দিনে অনেকেই পতাকার লাল-সবুজ রং দিয়ে তৈরি পোশাক পরে বিজয় উৎসবে মেতে উঠে। এ সময় ফ্যাশন হাউসগুলো সব বয়েসিদের জন্য পোশাক তৈরি করে। ছেলেদের টি-শার্ট, পাঞ্জাবি, মাথায় বাঁধার ব্যান্ডে থাকে লাল-সবুজের ছোঁয়া কিংবা কবিতার লাইন। নারীদের রয়েছে লাল-সবুজের আবহে নানা রঙের শাড়ি। শিশু, কিশোররা এই দিনে পরে লাল-সবুজের ছোঁয়ায় সজ্জিত নানা বাহারি পোশাক।

পছন্দের ডিজাইন: ফ্যাশন হাউসগুলোর করা ডিজাইন ছাড়া কেউ ইচ্ছে করলে নিজের পছন্দের ডিজাইনে বিভিন্ন সামগ্রী সাজাতে পারবেন। ঢাকার শাহবাগ আজিজ সুপার মার্কেট, নিউমার্কেট এলাকায় পাবেন এসব উপকরণ। ব্রেসলেটসহ নানা ফ্যাশন সামগ্রীতে এসব মার্কেট ফুটে উঠে পতাকার রঙে রঙিন হয়ে।

ছোট্ট বন্ধুরা, বাঙালির প্রাণের এই বিজয় আমরা নানা ভাবে ধারণ করে উদযাপন করতে পারি। দিতে পারো বন্ধুদের বিজয়ের স্মারক হিসেবে চাবির রিং, কার্ড, নানা রঙের স্টিকার। অলিগলি, ফুটপাতে কিংবা ভ্যানগাড়ি থেকে সহজেই সংগ্রহ করতে পারো এই স্মারকগুলো। এছাড়া দিতে পারো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ও গানের সিডি। আর এভাবেই সবাই মিলে উদযাপন করি আমাদের রক্তে পাওয়া মহান বিজয়। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

আরেক মীরজাফর

মুস্তাফা মাসুদ

জানুয়ারি ১৯৭১, আমি ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠলাম। দিন কয়েক ক্লাস চলার পর রায়পুর স্কুল থেকে একটা নতুন ছেলে এসে ভর্তি হলো আমাদের ক্লাসে। হ্যাংলা-পাতলা ছিপছিপে গড়ন।

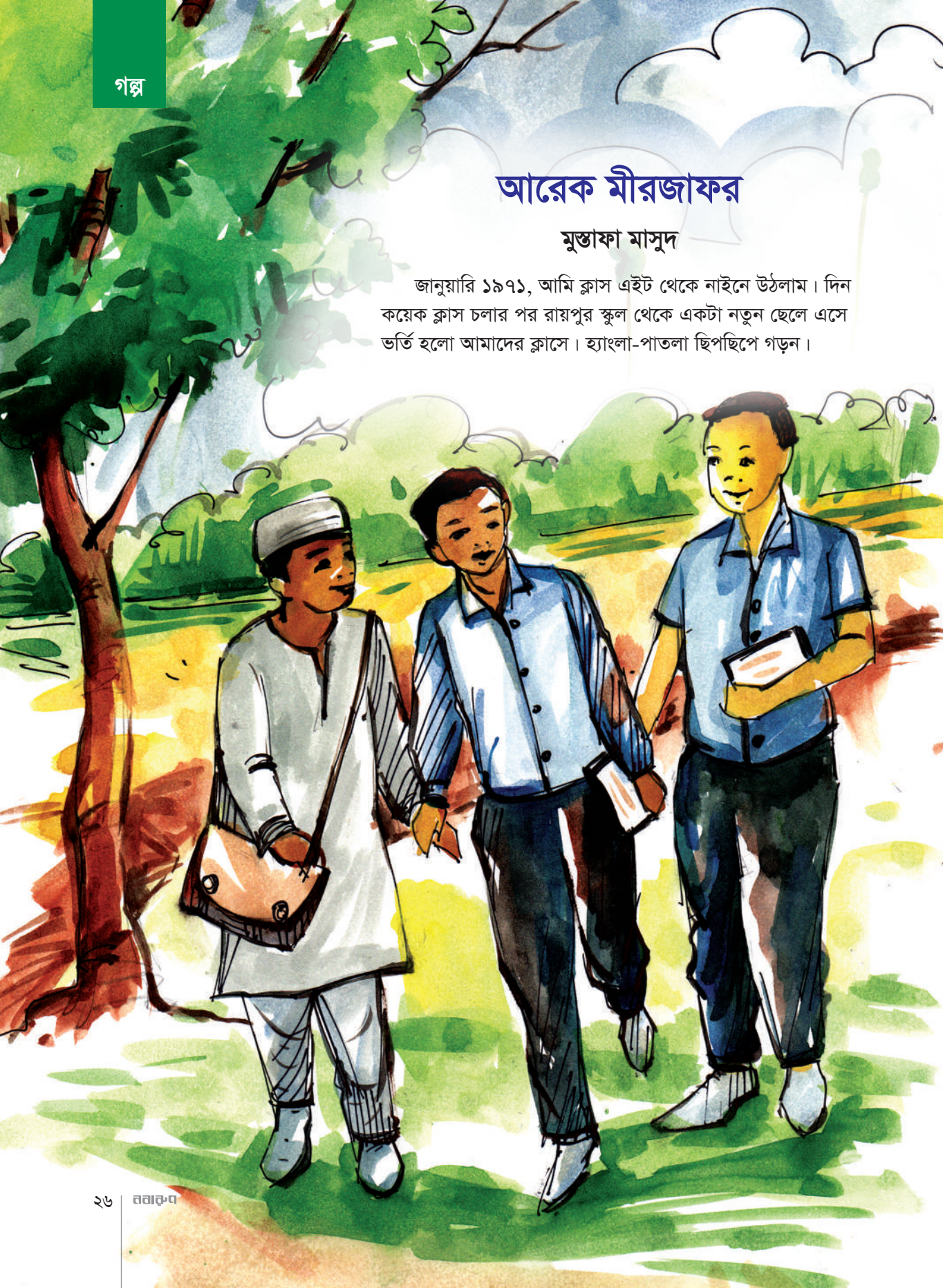

গায়ের রং শ্যামলা। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের কুচকুচে কালো, তাতে প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি। ঠোঁটে হাসির আভা যেন সবসময় লেগে আছে। হেড স্যার আমাকে ডেকে বললেন, মাসুদ, এর নাম হাশেম। তোমাদের ক্লাসে পড়বে আর থাকবেও তোমাদের বাড়িতেই। তোমার বাবার সাথে আমার কথা হয়েছে। যাও, ওকে নিয়ে ক্লাসে যাও।

বিকেলে স্কুল ছুটির পর হাশেমকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। আমাদের দেখেই মা এগিয়ে এলেন। ছোটো ভাইবোনেরা এল। বাবা বাড়িতে ছিলেন না, কিছুক্ষণ পর তিনিও এলেন বাইরে থেকে। হাশেমকে দেখে সবাই খুশি; যেন নিজেদের কোনো আপনজন বহুদিন পর বাড়ি ফিরে এসেছে। মা আমাদের খেতে দিলেন। খেয়ে-দেয়ে কেবল উঠেছি, তখনই শুনি ছোটো চাচার ডাক– মাসুদ, এই দ্যাখ কাকে নিয়ে এসেছি...

আমি ছোটো চাচার দিকে তাকাই। দেখি তার সাথে একটি ছেলে। ছেলেটি বেশ মোটাসোটা আর লম্বা। চোখ দুটো গোল গোল আর হালকা লাল। চাউনিতে এমন একটা ভাব যে, ষন্ডা-ষন্ডা মনে হয়। বেশ একটু ভয়ও করে। ছোটো চাচা হাসতে হাসতে বলেন, এর নাম আল কাশেমী। ও আমাদের মাদরাসায় পড়বে। আগামী বছর দাখিল পরীক্ষা দেবে। থাকবে এখানেই। তোদের কাচারি ঘরে তো দুটো খাট। একটাতে তোদের ছেলেটা আর একটাতে ও থাকবে। ভালোই হবে, কী বলিস? দুজন গপ্পসপ্পও করতে পারবে।

হাশেম আর আল কাশেমীর লজিং জীবন বেশ ভালোভাবেই কাটছে। প্রতিদিন সকালে আমি, হাশেম আর আল কাশেমী একসাথে বের হই স্কুল আর মাদরাসার উদ্দেশ্যে। আধ কিলোমিটার একসাথে যাওয়ার পর আমরা ডানদিকে মোড় নিই আর কাশেমী সোজা উত্তর দিকে হাঁটে। বাঁশের সাঁকোটা পার হলেই তার মাদরাসা। আমাদের স্কুল আরো খানিকটা দূরে।

এর মধ্যে দেশে পরিবর্তনের হাওয়া টের পাওয়া যাচ্ছে। মাত্র কিছুদিন আগে দেশে সাধারণ নির্বাচন হয়েছে। তাতে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ বিপুলভাবে বিজয়ী হয়েছে। এই ঘটনা বাঙালিদের ওপর দারুণ ছাপ ফেলেছে। অল্প দিনের মধ্যেই বাঙালিদের নেতা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন, এ এক বিরাট বিষয় তাদের কাছে। সবাই এ নিয়ে নানা আলোচনা করছে। আমাদের স্কুলেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। আমরা যেন অল্পদিনেই অনেক বড়ো হয়ে গেলাম। নির্বাচনে বাঙালির বিজয় রাজনীতির বিষয় আমাদেরকে অনেক সচেতন করে তুলেছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমাদের আগ্রহ আর কৌতূহলও বেড়েছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি, শহিদ দিবস এল। আমরা স্কুলের সামনে দু-দিন আগে বানানো শহিদমিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানালাম একুশের অমর শহিদদের। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হলো। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি?' এই গানে সবার সাথে আমি গলা মেলালাম, হাশেমও। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে হাশেম একক কণ্ঠে গাইল– 'ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়/ওরা কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে পায়।' চমৎকার সুর ওর গলায়। নিজেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইল। প্রায় দেড়টা মাস আমাদের বাড়িতে আছে, ও যে এত বড়ো পাকা গায়ক তা বুঝতে পারিনি। খুশিতে পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আমার। গান শেষে আমি ওকে আনন্দে জড়িয়ে ধরি।

অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। কাচারি ঘরে ঢুকতেই আল কাশেমী রুক্ষ মেজাজে হাশেমকে লক্ষ্য করে বলে– বড়ো গায়ক হয়ে গিয়েছ দেখছি! 'ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়, না? পাকিস্তানে বাস করে পাকিস্তানিদের প্রতি তোমার এত ঘৃণা! আর ওই যে ফুল দেওয়া! মুসলমানের ছেলে হয়ে এসব করে এলে! তোমরা দুজনই তো দেখছি ঘোর নাস্তিক ও কাট্টা জয় বাংলা!

তোমাদের সাথে আর থাকা চলে না। তাড়াতাড়িই আমি অন্য লজিং খুঁজে সেখানে চলে যাব। গজরাতে গজরাতে হঠাৎ কাচারি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কাশেমী। ওর এই আকস্মিক রাগ দেখে আমরা তো অবাক। আমরা বুঝতে পারি– সে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিল এবং তাতেই তার আসল চেহারা আর গোপন রাখতে পারেনি। ও এত দ্রুত বেরিয়ে গেল যে, ওর অভিযোগের কোনো জবাবই দেওয়া গেল না। আমাদের চিন্তার স্রোত নানা দিকে ছুটতে থাকে– তবে ও কী বাংলাদেশ বিরোধী? বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আজ বাঙালিদের যে মহাজাগরণ তাকে কী সে ভালো চোখে দেখছে না? আমি হাশেমকে বললাম– এই ব্যাটা পাকিস্তানিদের দালাল। ওর সাথে আমাদেরও থাকা নিরাপদ নয়। ও যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বিদেয় হয় ততই ভালো।

কাশেমী মিথ্যে বলেনি। পরদিন সকালেই সে লজিং বদল করে। জামায়াতে ইসলামীর এক স্থানীয় নেতার বাড়িতেই তার নতুন ঠিকানা। গত রাতেই ঠিক করেছে। যাওয়ার সময় সে আমাদের কারো সাথে একটা কথাও বলল না। ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে হাশেম ঘৃণা ভরে বলে– নিমকহারাম! যাদের আশ্রয়ে এতটা দিন থাকলি, তাদেরকে একটু বলেও গেলি না! মাসুদ, দেখে নিয়ো ভবিষ্যতে ও আরেকটা মীরজাফর হবে!

মার্চ মাস চলে এল। বাঙালিদের আশার গুড়ে ছাই দিয়ে ১লা মার্চ পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চে নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করে দিলেন। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধু গর্জে উঠলেন। তাঁর দল আওয়ামী লীগের কাছে প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন, এটাই তো হক কথা। এটাই তো ন্যায়নীতি। তা না করে প্রেসিডেন্ট চক্রান্ত শুরু করেছেন! এ তো অন্যায়। বঙ্গবন্ধুও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। তিনি সারা দেশে অসহযোগের ডাক দিলেন ছয় তারিখ পর্যন্ত; তারপর ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন। শুরু হলো অসহযোগ। সারা দেশ চলতে লাগল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই। আমরা স্কুলেও বসে থাকলাম না। আমরা প্রতিদিন মিছিল বের করি। দু-একজন ছাড়া প্রায় সব ছাত্রছাত্রীই তাতে যোগ দিচ্ছে। 'ইয়াহিয়া নিপাত যাও, বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা ছেড়ে দাও'– এমনি সব স্লোগানে আমরা চারদিক কাঁপিয়ে দিতে থাকি। হেডস্যারসহ বেশিরভাগ শিক্ষকই আমাদের সাপোর্ট করলেন, উৎসাহ দিলেন। মিছিল শেষে স্কুলের সামনে সভা করি। এ সময় হাশেমের আরেকটি গুণের পরিচয় পেলাম। সে একজন তুখোড় বক্তা। সভায় তার গরম বক্তৃতা শুনে সবার রক্ত যেন টগবগ করে। সবার মধ্যে সে কী জাগরণ! যেন এখনই তারা ইয়াহিয়াকে তাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত!

সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিলেন ঢাকার রেসকোর্সে। রেডিওতে তা সরাসরি প্রচার হওয়ার কথা থাকলেও হলো না। তাই আমরা শুনতে পেলাম না। পরদিন রেকর্ড করা ভাষণ ঢাকা রেডিও থেকে প্রচারিত হলো। আমাদের বাড়িতে একটা ছোটো রেডিও ছিল, সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনলাম। ভাষণ শেষ হলে বাবা এবং ছোটো চাচা আমাকে আর হাশেমকে ডেকে কাচারি ঘরে ঢুকলেন। কাচারি ঘরের দরজা বন্ধ করে বাবা বললেন– দেখো, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি– যুদ্ধ ছাড়া পথ নেই। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। শুনলে না, বঙ্গবন্ধু সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বললেন? তাই আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে– যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে হবে। তারপর চূড়ান্ত ডাক এলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে মুক্তিযুদ্ধে। তোমরা তো জানোই– আমি ইপিআর-এর অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। ট্রেনিং আমিই দেবো। তবে খুব গোপনে সবকিছু করতে হবে। আর হ্যাঁ, মাসুদ ও হাশেমও ট্রেনিং নেবে। অবস্থা খারাপ হলে ওদেরকেও যুদ্ধে নিয়ে যাব। কি বাবারা, পারবা না?

অবশ্যই পারব, চাচাজান। হাশেম আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে। আমিও জোর গলায় বলি– 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার/লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি

নিশিথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার!' বাবা, ছোটো চাচা, আমিও তোমাদের সাথে যুদ্ধে যাব। আমিও ট্রেনিং নেবো। বাবা আর ছোটো চাচা আমাদের পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিলেন।

পরদিন সন্ধ্যার পর থেকেই খালপাড়ের আমবাগানে ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল। প্রতিদিন রাত দুটো-আড়াইটা পর্যন্ত তা চলে। গোটা বিশেক কাঠের ডামি-রাইফেল আর বাঁশের লাঠি দিয়ে প্রথমে শুরু হলেও পরবর্তীতে তিনটি থ্রি নট থ্রি রাইফেলও জোগাড় হয়েছে কীভাবে যেন। থানা আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মী ট্রেনিংয়ে যোগ দিল। দু-একদিনের মধ্যে আশপাশের গ্রামের কিছু তরুণ-যুবকও যোগ দিল।

একদিন শুনলাম ইয়াহিয়ার সাথে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে এবং ইয়াহিয়া রাতের অন্ধকারে ঢাকা ত্যাগ করেছে। বাবা বললেন– যুদ্ধের সময় বোধ হয় আর বেশি নেই। পরদিন শোনা গেল এক গুরুতর ঘটনা– ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগের পরই ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে বর্বর গণহত্যা চালিয়েছে। ওই রাতেই তারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করেছে। তবে খুশির কথা হলো– গ্রেফতার হওয়ার আগেই ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে গেছেন– জনগণকে তিনি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে গেছেন।

আমাদের ট্রেনিং তখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। তবে যা হয়েছে তাও মন্দ নয়। কিন্তু আর তো দেরি করা চলে না! হানাদারেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঙালিদের ওপর। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর কথা মতো আমাদেরকেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, 'যার যা আছে তাই নিয়ে'। ঠিক হলো– মার্চের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত ট্রেনিং চলবে।

এর মধ্যে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতিও নিতে হবে। মোট একশ ত্রিশ জন ট্রেনিং নিচ্ছি। আমি আর হাশেম একটু ছোটো হলেও ট্রেনিংয়ে খুব ভালো করছি– বিশেষ করে হাশেম এত চৌকষ হয়ে উঠল যা রীতিমতো অবাক করার মতো।

বাবা বললেন– তোমরা প্রাথমিক ট্রেনিং নিলেও যুদ্ধের জন্য আরো শেখা দরকার। তাই প্রথমেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আমরা ভারতে চলে যাব। সেখানে কিছুদিন ট্রেনিং নিলেই তোমরা পাকা যোদ্ধা হয়ে যাবে।

পয়লা এপ্রিল রাতে আমরা চৌগাছা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলাম। ভারতে আমাদের ট্রেনিং হলো একমাস। এবার সবার হাতে আসল অস্ত্র। গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শিখলাম। এবারও হাশেম চোখধাঁধানো দক্ষতা দেখালো। শেষমেষ প্রচুর অস্ত্র আর গোলাবারুদসহ আমাদেরকে নিজ এলাকাতেই পাঠানো হলো। এলাকায় এসে আমরা শুনলাম রাজাকার নামে এক বেঈমান বাহিনী গঠিত হয়েছে। তার পাশাপাশি আছে শান্তি কমিটি। তারা পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগী হিসেবে এলাকায় ততদিনে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। সত্তরের নির্বাচনে এই এলাকায় নৌকার প্রার্থী বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিলেন আর জামায়াত প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ এসেছে। রাজাকারেরা আওয়ামী লীগ সমর্থক ও স্বাধীনতার পক্ষের নিরীহ সাধারণ মানুষদের বাড়িঘর লুট করছে। অনেকের ঘরবাড়িতে আগুনও দিচ্ছে। অত্যাচার-নির্যাতন করছে। অনেককে গুলি করে মারা হয়েছে। আরো শুনলাম– আল কাশেমী রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে এবং সে নাকি সহকারী কমান্ডার হয়েছে। একদিন রাইফেল কাঁধে নিয়ে দলবলসহ আমাদের বাড়ি ঘুরেও এসেছে। আমাদের খোঁজখবর নিয়েছে। মা বলেছে– আমি বাবার সাথে মামাবাড়ি গিয়েছি। কাশেমী আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করেনি। তবে তার নিষ্ঠুরতার খবর এসেছে আমাদের কাছে। সে আমাদের বন্ধু জলিলকে নিজের হাতে জবাই করেছে। আমাদের উপরের ক্লাসের জমির ভাই আর তার বাবাকে গুলি করে মেরেছে। তাদের একমাত্র অপরাধ– তারা স্বাধীনতার পক্ষের লোক। শুনলাম– রাজাকার বাহিনীতে আল কাশেমীর খুব দাপট। কারণ, তার লজিং মাস্টার জামায়াত নেতা বশির আলি এই ক্যাম্পের কমান্ডার। তাই সে যখন যা মনে হয় তাই করে। তার অপকর্মের, বিশেষ করে ওই তিনটি খুনের খবর পেয়ে আমি আর হাশেম শপথ করি ওই হারামি রাজাকারটাকে এবং তার দলবলকে নিকেশ না করে ছাড়ব না।

আমরা আমাদের গ্রাম থেকে মাইলখানেক দূরে জল থই থই বিলবেষ্টিত মধুপুর গ্রামের গভীর শালবনে অবস্থান নিয়েছি। এক বিকেলে হাশেম আমাকে বলে– দোস্ত, কাশেমীকে দেখতে বড়ো ইচ্ছে করছে। ও নাকি রাজাকার হয়ে দাপট দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। একে-ওকে খুন করছে। ওর চেহারা কি এখনো মানুষের মতো আছে, নাকি বুনো জানোয়ারের মতো হয়ে গেছে? ও তো কোরান-হাদিস পড়ে, ওকে জিজ্ঞেস করতে চাই– কোথায় পেয়েছে মানুষ হত্যার বিধান? নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন আর লুটপাটের ফতোয়া?

আর কী আশ্চর্য– সেদিন রাতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, আগামীকাল মধ্যরাতেই থানা সদরের রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করা হবে। আমাদের বেশিরভাগেরই বাড়ি থানা সদরের আশপাশেই। ওখানকার সব আমাদের চেনা। তাই যুদ্ধের পরিকল্পনা সাজাতে আমাদের বেগ পেতে হলো না। আমাদের কমান্ডার– আমার বাবা যুদ্ধের সমস্ত খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন। ঠিক হলো– উত্তর আর পুব দিক থেকে হামলা হবে। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি– রাজাকারের সহকারী কমান্ডার আল কাশেমী সিও অফিস কমপ্লেক্সে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন অফিসার অর্থাৎ পিআইও-এর পরিত্যক্ত বাসায় একাই থাকে। দালানটি পুবমুখী। তাই পূর্বদিকে যে দলটিকে মোতায়েন করা হলো, সেই দলে আমি আর হাশেমও থাকলাম।

রাত ঠিক বারোটা বারো মিনিটে আমরা ফায়ার ওপেন করলাম। সেই সাথে গ্রেনেড নিক্ষেপ। আক্রমণটা এত ক্ষিপ্রগতিতে চালানো হলো যে, রাজাকারেরা ভালোভাবে বুঝে ওঠার আগেই পুরো ক্যাম্পের নিয়ন্ত্রণ আমাদের কব্জায় এসে গেল। চিৎকার করে ওদেরকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে সবার অলক্ষ্যে আমি আর হাশেম গ্রেনেড আর এসএমজি নিয়ে পিআইওর বিল্ডিংয়ের দোতলায় উঠে যাই পানির পাইপ বেয়ে। বারান্দায় উঠেই হাশেম চিৎকার করে বলে- কাশেমী! মুক্তিযোদ্ধারা তোদের ক্যাম্পের দখল নিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র ফেলে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাক...

এ পর্যন্ত বলেই হাশেম বারান্দার দিকের দরজায় সজোরে ধাক্কা মারতেই দরজা খুলে গেল, কিন্তু ভেতরে কেউ নেই! দ্রুত অস্ত্র হাতে আমরা ঘরে ঢুকে যাই। না, কোনো রুমেই সে নেই। হঠাৎ রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাতেই দেখি এদিকের পানি নিষ্কাষণ পাইপ জড়িয়ে ধরে বেশ নিচের দিকে কে যেন সেঁটে আছে। হাশেম চিৎকার করে বলল– কাশেমী, তোমার সব কেরামতি শেষ। অস্ত্র ফেলে নিচে নেমে যাও, আমরা আসছি। পালাবার চেষ্টা করো না। তাতে কোনো লাভ হবে না; উলটো মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি খেয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাবে।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নিচে নেমে আসি। এসেই দেখি ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা অস্ত্র উঁচিয়ে ওর দিকে এগিয়ে যাই– হাশেম আগে, আমি একটু পেছনে। হঠাৎ মুহূর্তেই কাশেমী কোমর থেকে পিস্তল বের করে হাশেমের দিকে তাক করে এবং চিৎকার করে বলে– হ্যান্ডস 'আপ'... বলার আর সময় পায় না। ততক্ষণে হাশেমের এসএমজি রাজাকারটার বুক ঝাঁঝরা করে দেয়। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ড্রেনের পাশে। হাশেম টর্চ জ্বালিয়ে ব্যস্তভাবে আমাকে বলে– মাসুদ, দেখো তো ওর মুখটা মানুষের না হিংস্র বুনো জানোয়ারের! ■

লেখক: শিশুসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক

অম্লান দিন

শচীন্দ্র নাথ গাইন

পথঘাট হাট-মাঠ-বিল-নদী-খাল
রক্তের বন্যায় ভেসে হয় লাল।
দস্যুরা রাঙা করে তাজা খুনে হাত
বিভীষিকা ছেয়ে থাকে সারা দিনরাত।
ছেলেহারা মা কাঁদে মেয়েহারা বাপ
ফুটে ওঠে দেশজুড়ে ভীতিকর ছাপ।
চিৎকার আহাজারি বেদনার শোক
জলধারা থেমে হয় ক্ষোভ জমা চোখ।
খালি করে দেয় ওরা অগণিত বুক
কেড়ে নেয় অনাচারী এ জাতির সুখ।
শোকাহত মানুষেরা মনে গাথে জিদ
ভুলে যায় একেবারে খাওয়াদাওয়া নিদ।
জীবনের বাজি রেখে শুরু করে রণ
স্বাধীনতা আনবই- ছিল এই পণ।
নয় মাস লড়ে পাওয়া কাঙ্ক্ষিত জয়
এই দিন অম্লান রবে অক্ষয়।

মুক্তিযুদ্ধে ভিনদেশি বন্ধুরা

বিনয় দত্ত

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এমন কিছু মানুষ নিজেদের অবস্থান থেকে অবদান রেখেছেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন, শুধুমাত্র বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ভালোবেসে তথা বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে। যা বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু এরা কেউই বাংলাদেশের মানুষ নন। তারা অন্যায়ের জবাব দিতে গিয়ে কখন যে নিজেকে যুদ্ধে অবতীর্ণ করেছেন তা নিজেরাও বলতে পারবেন না।

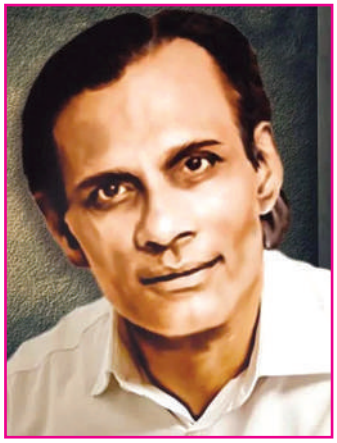

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সাংবাদিক সাইমন ড্রিং

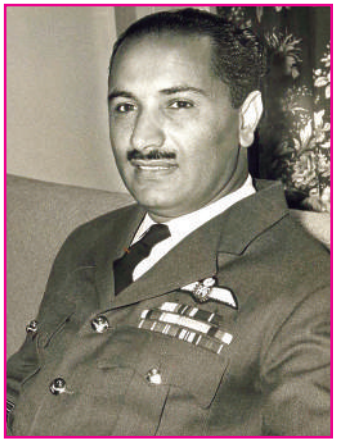

এয়ার মার্শাল আসগর খান

যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া মানুষগুলো আমাদের পরমবন্ধু, পরম মিত্র, পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের শক্তি মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক সাহসী করেছে, রণাঙ্গনের সশস্ত্র যোদ্ধাদের উদ্দীপনা জুগিয়েছে। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই লেখার সূত্রপাত।

পুরো মুক্তিযুদ্ধে যিনি সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন, পুরো সময় জুড়ে বিপন্ন বাঙালিদের অভিভাবক হিসেবে থেকেছেন, এক কোটি উদ্বাস্তুকে তাঁর দেশে আশ্রয় দিয়েছেন, শুধু আশ্রয়ই নয়, তাদের থাকা-খাওয়া চিকিৎসাসহ অন্যান্য সাহায্যও করেন, এমনকি বীরের জাতি বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দেয়ারও সু-ব্যবস্থা করেছেন তিনি হলেন ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী, মমতাময়ী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।[১] একজন অভিভাবক কেমন হতে পারেন তা ইন্দিরা গান্ধীকে না দেখলে, তাঁর অবদানের কথা না জানলে বিশ্বাস করা যাবে না।

ইন্দিরা গান্ধী একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দেয়ার জন্য যা যা করণীয় সবই করেছেন। এই নারীর সহযোগিতা না পেলে যে স্বাধীনতা আমরা নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে পেয়েছি, হয়ত সেই স্বাধীনতা পেতে আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হতো। হয়ত সেই স্বাধীনতা আমরা কখনোই অর্জন করতে পারতাম না। এইটা ভেবে মনে হয় সত্যিই তিনি পরম পূজনীয়।

একজন দিলেন আশ্রয় আরেকজন লিখলেন অসাধারণ দুটি গান। বলছিলাম একাত্তরের অনুপ্রেরণা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় দারুণ দুটি গান রচনা করেছেন। সেই দুটি গানের একটি 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে/ লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি/ আকাশে-বাতাসে ওঠে রণি:/ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ'। অন্যটি 'মা গো ভাবনা কেন/ আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে/ তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি/ তোমার ভয় নেই মা আমরা/ প্রতিবাদ করতে জানি।'[২]

এই দুটি গান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয়টি মাস আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে যত গান লেখা হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গান হলো প্রথম গানটি এবং এই একটি গানে বঙ্গবন্ধুকে যেভাবে পাওয়া যায় আর কোনো গানে তাঁকে সেভাবে পাওয়া যায় না। আসলেই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার মহান গীতিকবি। মজার ব্যাপার হলো, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও এই গান দুটির আবেদন এখনো সজীব। এই গান শুনলেই শরীরে উত্তেজনা ভর করে।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। আমার বাড়ি ছিল পাবনায়। ১৯৪৭ সালে ভারতে চলে আসি। কিন্তু আমার মন পড়ে ছিল বাংলাদেশে। তাই গান দুটি লিখে সেই জন্মস্থানের ঋণ কিছুটা হলেও আমি শোধ করেছি।'[৩]

আহা মাতৃভূমির প্রতি কী অগাধ ভালোবাসা। এই রকম ভালোবাসা আছে বলেই তিনি অসাধারণ দুটি গান রচনা করতে পেরেছেন। শুধু কী গান? একাত্তরে এই রকম লেখালেখির অবদান যে কত ছিল তা বর্ণনাতীত। মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন পাকিস্তানিরা আমাদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার আর গণহত্যা চালাচ্ছিল সেই সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই গণহত্যা ঘুরে ঘুরে দেখেছেন সাংবাদিক সাইমন ড্রিং। যিনি একাত্তরের পরম বন্ধু। ১৯৭১ সালে সাইমন ড্রিং লন্ডনের দৈনিক দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ–এর রিপোর্টার। লন্ডনের সদর দপ্তর থেকে ফোন করে তাকে বলা হলো, 'পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত। সেখানে বড়ো কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তুমি ঢাকা যাও।'

সাইমন ঢাকায় আসলেন। ঢাকার পরিস্থিতি খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। ২৫শে মার্চ গণহত্যার সময় সকল বিদেশি সাংবাদিকদের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবরুদ্ধ করা হয়। সাইমনও তাদের মধ্যে ছিল। ২৭শে মার্চ সকালে তিনি হোটেলের কর্মচারীদের সহযোগিতায় ছোট্ট একটি মোটরভ্যানে করে ঘুরে ঘুরে দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করছেন মারিনো রিগন

হল, রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক ও পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকা। ঘুরে দেখা সেই দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারেননি। তাই লিখে ফেলেন ভয়ানক এক প্রতিবেদন। 'ট্যাংকস ক্র্যাশ রিভোল্ট ইন পাকিস্তান' শিরোনামের বিখ্যাত সেই প্রতিবেদন লন্ডনের দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ৩০শে মার্চ ছাপা হয়। মূলত এই প্রতিবেদনের পরপরই সারা পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে পাকিস্তানিরা এই দেশের নিরপরাধ মানুষের উপর কীভাবে অত্যাচার, নির্যাতন ও গণহত্যা চালিয়েছে।[৪]

দুই

একাত্তরের বন্ধু এয়ার মার্শাল আসগর খান। তাহরিক-ই-ইশতেকলাল পার্টির প্রধান আসগর খান ৪ঠা মার্চ ১৯৭১ করাচি প্রেসক্লাবে বৃহৎ এক সংবাদ সম্মেলনে একটি বক্তব্য দেন। ৫ই মার্চ ১৯৭১ করাচির ইংরেজি দৈনিক ডন তা বিস্তারিত প্রকাশ করে। মূলত তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ব্যভিচারী কর্মকাণ্ডের কথা সকলেই জেনে যায়। তাই আসগর খান বলেছিলেন, 'জাতীয় অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার সার্থে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উচিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী শেখ মুজিবুর রহমানকে ডেকে অবিলম্বে তাঁর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।'[৫]

ভাবা যায়, নিজ দেশের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে তারই দেশের এয়ার মার্শাল আসগর খান ইয়াহিয়ার ভুল শুধরে সঠিক পথে আসতে বলছেন। আসগর খান যে সাহস দেখিয়েছেন তখন এই ধরনের সাহস দেখিয়ে কথা বলার মতো লোকই ছিল না।

আসগর খানের মতো আরেকজন লোক কথা বলে সবাইকে সাহস ও অনুপ্রেরণা দিতেন। তিনি হলেন, বেতারে মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠস্বর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তখন খবর পড়তেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আকাশবাণীতে। 'আকাশবাণী কলকাতা, খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়' ভরাট কণ্ঠের এই সম্ভাষণ বাংলাদেশের মানুষকে আশ্বস্ত করত। তার আবেগভরা কণ্ঠস্বর আশাজাগানিয়া হয়ে ওঠে যুদ্ধরত বাঙালিদের কাছে। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজেকে উজাড় করে দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন শব্দ সংগ্রামী হয়ে উঠেছিলেন। কোটি মানুষের আগ্রহের একটি বিন্দু হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, 'আমার কাজ ছিল সংবাদ পড়া। পড়তে পড়তে একটু ভালোলাগার ব্যাপারও ছিল। আমি কখনো পূর্ববঙ্গ দেখিনি, পূর্ববঙ্গে যাইনি। রেডিওর চাকরি সূত্রে দেশটাকে জেনেছি। আমি একেবারেই পশ্চিমবঙ্গের ছেলে। পূর্ববঙ্গকে জেনেছি, ভালোবেসেছি।'[৬]

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'অদেখা পূর্ববঙ্গের অচেনা বঙ্গভাষীদের প্রতি নৈকট্যবোধে আমার মন আপ্লুত হয়েছে বার বার। আর কল্পনায় গড়ে তুলেছিলাম বাংলাদেশ নামের একটি মানসী মূর্তিকে।'[৭]

আরেকজন পরম বন্ধু হলেন মারিনো রিগন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংগঠক ও সহায়তাকারী একজন বন্ধু। তিনি ছিলেন ইতালির নাগরিক। ১৯৫৩ সালে ২৮ বছর বয়সে ধর্মপ্রচার করতে বাংলাদেশে এসেছিলেন ফাদার মারিনো রিগন। ১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, তখন তিনি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিতেন। শুধু তাই নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করতে তিনি চারটি নৌকা বানিয়েছিলেন– 'সংগ্রামী বাংলা', 'রক্তাক্ত বাংলা', 'স্বাধীন বাংলা' ও 'মুক্ত বাংলা'। মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলো উঠে এসেছে তার ডায়েরিতেও। নিজের ডায়েরি ও চারটি নৌকা ২০০৬ সালের ২৮শে নভেম্বর তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দিয়ে দেন।[৮]

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আরেকজন সখা হলেন এডওয়ার্ড কেনেডি। তিনি ছিলেন মার্কিন সিনেটর। পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যাযজ্ঞের খবর তখনো ছড়াইনি। ঢাকা থেকে মার্কিন কনসাল আর্চার বাডের গোপন রিপোর্ট পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন এডওয়ার্ড কেনেডি। তিনি ১লা এপ্রিল ১৯৭১ মার্কিন সিনেটে বাংলাদেশ-সংক্রান্ত তার প্রথম বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, 'মাননীয় সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ঘটনার বিপুল জটিলতা আমি অনুধাবন করি। কূটনীতিক ও মানবতাবাদীদের জন্য এ এক জটিল বিষয়। তবে আমাদের সরকার কি এই হত্যাযজ্ঞের নিন্দা করবে না? সংঘাতের শিকার হওয়া লাখো মানুষের ভাগ্যবিড়ম্বনা নিয়ে আমরা কি ভাবিত হব না? আমরা কি সহিংসতা রোধে আমাদের উত্তম সেবা দিতে চাইব না, অন্তত তেমন প্রচেষ্টা যাঁরা নেবে তাঁদের সহায়তা করব না?'

শুধু তাই নয়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য মার্কিন সিনেটর স্যাক্সবি উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থক হলেন এই এডওয়ার্ড কেনেডি।[৯]

তিন

'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'[১০]। শব্দটি শুনলেই দুইজন মানুষের মুখ প্রথমেই ভেসে উঠে। একজন শাস্ত্রীয় সংগীতের গুরু পণ্ডিত রবিশঙ্কর আরেকজন ষাটের দশকে বিশ্বে সাড়া জাগানো বিখ্যাত ব্রিটিশ ব্যান্ড বিটলসের অন্যতম সদস্য জর্জ হ্যারিসন। এই দুইজন একাত্তরের পরম বন্ধু।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। অগণিত মানুষ শহিদ হতে লাগল, কোটি মানুষ ভিটে ছাড়া। পাকিস্তানিদের অত্যাচারে দেশের মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত। জন্মভূমির মানুষের জন্য পণ্ডিত রবিশঙ্করের প্রাণ কেঁদে উঠল। দেরি না করে ছুটে গেলেন জর্জ হ্যারিসনের কাছে। বললেন, যুদ্ধে আক্রান্ত অসহায়দের জন্য কিছু করতে হবে। দুজনে ঠিক করলেন, বাংলাদেশের মানুষের সহায়তায় তহবিল সংগ্রহের জন্য একটি কনসার্ট করা হবে। ১৯৭১ সালের ১লা আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হলো সাড়া জাগানো সেই কনসার্ট 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'।

কনসার্টের শুরুতে বাংলাদেশের পল্লিগীতির সুরে 'বাংলা ধুন' নামে একটা পরিবেশনা করেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। আর শেষে নিজের লেখা ও সুরে ৪০ হাজার মানুষের সামনে জর্জ হ্যারিসন গাইলেন সেই বিখ্যাত গান, 'বন্ধু আমার এল একদিন/ চোখ ভরা তার শুধু

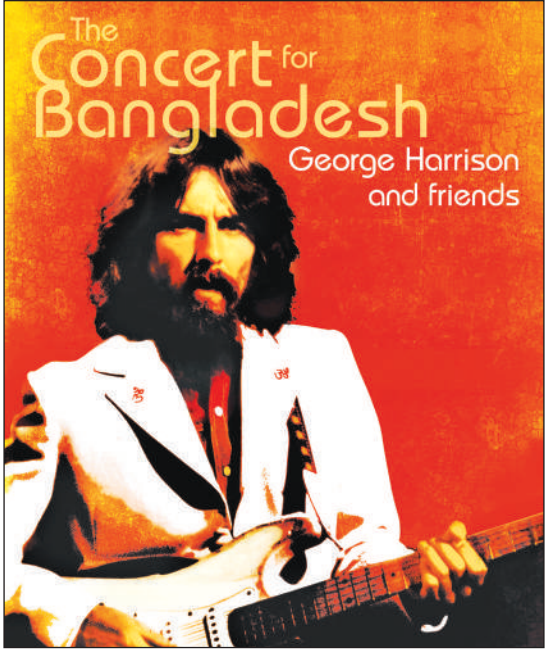

পণ্ডিত রবিশঙ্কর

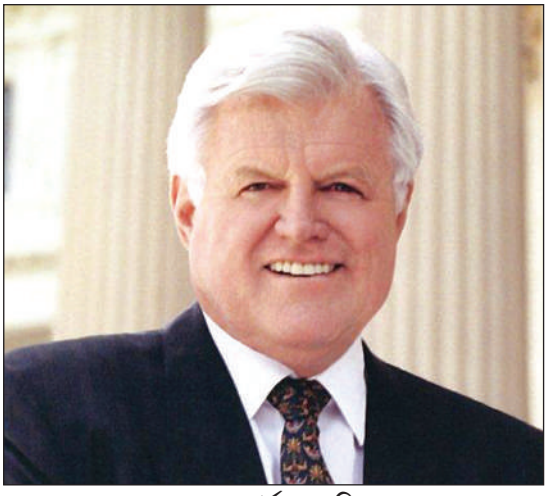

এডওয়ার্ড কেনেডি

হাহাকার/ বলল কেবল সহায়তা চাই/ বাঁচাতে হবে যে দেশটাকে তার/ বেদনা যদিবা না-ও থাকে তবু/ জানি আমি, কিছু করতেই হবে/ সকলের কাছে মিনতি জানাই/ আজ আমি তাই/ কয়েকটি প্রাণ এসো না বাঁচাই/ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ/' ।[১১]

এই একটি গানের মধ্যদিয়ে সারা বিশ্বের মানুষ জেনে গেল বাংলাদেশের কথা। যে বাংলাদেশকে বুকে ধারণ করে জর্জ হ্যারিসন গান গেয়েছেন সেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের চিত্র ধারণ করেছেন লিয়ার লেভিন। যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার চিত্রগ্রাহক ও পরম বন্ধু। লিয়ার লেভিন একাত্তরে এসেছিলেন বাংলাদেশে, নিজের জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা' নামক একটি দলের সাথে সারাদেশে ঘুরেঘুরে ভিডিও করেছেন। তার দৃশ্যপটে উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধের বিরল সব চিত্র।

শিল্পীদের সাথে থেকে তিনি সেই সময় প্রচুর ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি ডকুমেন্টরি নির্মাণ করবেন। অর্থের অভাবে তার সেই ইচ্ছে আর পূরণ হয়নি। লিয়ার লেভিন অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেগুলো তুলে রেখেছিলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। দীর্ঘ বিশ বছর পর তার অপেক্ষার অবসান ঘটে। বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ নিউইয়র্কে তাকে খুঁজে বের করেন। তার তৈরি ৭২ মিনিটের ফুটেজ দিয়ে 'জয় বাংলা' ও 'মুক্তির গান' শিরোনামে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, যা মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত।

চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ তার নিবন্ধ সংকলন 'চলচ্চিত্র যাত্রা'এ 'লিয়ার লেভিন: আমাদের মুক্তির সারথী' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন–'শুধু লিয়ার লেভিনের ফুটেজ নয়, মুক্তির গানের জন্য আমরা যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, কানাডা, ফ্রান্স, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। সেগুলো দেখে মনে হয়েছে লিয়ারের কাজের সামনে লাখো ঘণ্টার ফুটেজও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে সেবাদানকারী লুসি হল্ট

কিছু না। তাঁর ফুটেজ ও সহযোগিতায় 'মুক্তির গান' এর অস্থিমজ্জা দাঁড়িয়েছে।'[১২]

একাত্তরের ভিডিও ফুটেজ দিয়ে যেমন 'জয় বাংলা' ও 'মুক্তির গান' চলচ্চিত্র নির্মিত হয় একাত্তরের অভিজ্ঞতা নিয়ে তেমনি সাড়া জাগানো একটি কবিতাও লেখা হয়। মুক্তিযুদ্ধের কবিতায় অনন্য রূপকার হলেন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ। যিনি জনপ্রিয় মার্কিন কবি।

১৯৭১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর, অ্যালেন গিনসবার্গ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী উদ্বাস্তু শিবিরগুলো পরিদর্শন করতে কলকাতা থেকে যশোর রোডে বেরিয়ে পড়েন। শরণার্থীদের মৃত্যুময় দৃশ্যপটের মধ্যে বন্যার পানি ভেঙে ঢুকে পড়েন মার্কিন এই কবি। শরণার্থীদের তাঁবুতে তাঁবুতে তিনি ঘুরেছেন। তাদের সাথে কথা বলেছেন। দেখছেন খাদ্যের অভাবে কীভাবে ধুঁকছে লাখ লাখ মানুষ, মরণাপন্ন বাবা-মায়ের জন্য ওষুধ না পেয়ে কীভাবে মাথা কুটছে সন্তান, বমি করতে করতে কীভাবে মরছে শিশুরা। এইসব তিনি স্মৃতিতে নিয়ে ফিরে গেলেন নিউইয়র্কে। এরপর অনেক সময় কেটে যায়। নভেম্বরের ১৪ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত এ অভিজ্ঞতা একটি কবিতায় রূপ দেন। ভিলেজ ভয়েস ও নিউইয়র্ক টাইমস-এ 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' নামে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটি প্রকাশের পর হুলুস্থুল পড়ে যায় সর্বত্র।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'শরণার্থী শিবিরে ঘুরে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল আমার। অক্টোবরে নিউইয়র্কে ফিরে গেলাম। প্রতিদিনই ভাবতে থাকি, বাংলাদেশের জন্য আমি কী করতে পারি। হঠাৎ মাথায় এল, আমি কবিতা লিখতে তো পারি। লিখেও প্রতিবাদ করা যায়। কয়েক দিন ঘরে থেকে লিখলাম একটি দীর্ঘ কবিতা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'। আমার 'বিবি ক্যানিয়ন টু যশোর রোড' নামের বইটিতে কবিতাটি ছাপা হয়েছে।'[১৩]

চার

একাত্তরের যে ক'জন বিদেশি বন্ধুর কথা বলেছি তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি যেই দিন জন্মেছেন সেইদিন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। শুনে অবাক লাগছে? অবাক হলেও ঘটনা সত্যি। বলছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সেবাদানকারী বন্ধু লুসি হল্টের কথা। ১৯৩০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর যুক্তরাজ্যের সেন্ট হ্যালেন্সে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিটেনের নাগরিক লুসি বাংলাদেশে এসেছিলেন ১৯৬০ সালে। সেইবার প্রথম বাংলাদেশে এসে যোগ দেন বরিশাল অক্সফোর্ড মিশনে। এখানে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের পড়াতেন। ১৯৭১ সালে লুসি যশোর ক্যাথলিক চার্চ স্কুলে ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে চার্চের সহকর্মীরা খুলনা চলে যান। কিন্তু লুসি যুদ্ধাহতদের সেবা করার ইচ্ছায় যোগ দেন যশোরের ফাতেমা হাসপাতালে। এক সাক্ষাৎকারে লুসি বলেন, 'আমি ডাক্তার নই, কিন্তু তখন অনেককে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। ডাক্তাররাও তখন আগের মতো হাসপাতালে আসতেন না। ডাক্তারও অবশ্য বেশি ছিল না।'[১৪]

লুসি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভক্ত। ১৯৭১ সালে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন ব্রিটেনে নিজ বন্ধু ও স্বজনদের চিঠি লিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর লুসি আর নিজ দেশে ফিরে যাননি। কর্মজীবন থেকে ২০০৪ সালে অবসর নেওয়ার পর লুসি এখনও বাংলাদেশে থেকে দুস্থ শিশুদের মানসিক বিকাশ ও ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি শিশুদের জন্য তহবিলও সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের প্রতি লুসির ভালোবাসা দেখে বর্তমান সরকার লুসি হল্টকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেন।

এইরকম মহান কিছু বিদেশি বন্ধুদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ আজকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। নিজেদের অধিকার আদায় করতে পেরেছে। এইসব বিদেশি বন্ধুদের ঋণ আমরা কখনোই শোধ করতে পারব না। তাই তাদের প্রতি রইল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ■

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

তথ্যঋণ

১. *হাসান (২০১৭), সোহরাব, ইন্দিরা গান্ধী দুঃসময়ের বন্ধু, প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৬, ২০১১*

২. *হুসেন (২০১৮), আখতার, মুক্তির ইতিহাসে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের দুই গান, প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৯, ২০১৮*

৩. *ঐ, প্রাগুক্ত*

৪. *আহমেদ (২০১৭), আলমগীর, পঁচিশে ও ছাব্বিশে মার্চের ঢাকা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা, [সম্পা. সোহরাব হাসান], তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৭, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। পৃ: ১৭২-১৮০*

৫. *হাসান (২০১৯), সোহরাব,বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চেয়েছিলেন ৪২ পাকিস্তানি, প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৪, ২০১৯*

৬. *আজাদ (২০১৭), সালাম, সেদিন বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা, [সম্পা.সোহরাব হাসান], তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৭, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। পৃ: ১০২-১০৩*

৭. *নিজস্ব প্রতিবেদক (২০১৮), বেতারে মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠস্বর, প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১২, ২০১৮*

৮. *মাহমুদ (২০১৭), রাসেল, ফাদার রিগনের দিনলিপি, প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৮, ২০১৭*

৯. *হক (২০১৬), মফিদুল, বাংলাদেশের জন্য এক মানবতাবাদী সিনেটর, প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৬, ২০১৬*

১০. *চৌধুরী (২০১৭), কাজল, যেভাবে হলো কনসার্ট ফর বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা, [সম্পা. সোহরাব হাসান], তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৭, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। পৃ: ১০৬-১০৭*

১১. *রহমান (২০১৬), মতিউর, বব ডিলান ও দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ, প্রথম আলো, অক্টোবর ১৫, ২০১৬*

১২. *স্বপ্নচারী (২০১৩), নিভৃত, একাত্তরের বিদেশী বন্ধুগণঃ আমাদের দুঃসময়ের সূর্যসারথি (পর্ব-৩), মুক্তমনা বগ, জুলাই ০৩, ২০১৩*

১৩. *মামুন (২০১৯),নাসির আলী, শরণার্থীশিবিরে ঘুরে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল, প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১৯*

১৪. *ইসলাম (২০২০), রফিকুল, ৯০ বছর বয়সেও মানুষের সেবায় লুসি হল্ট, কালের কণ্ঠ, জানুয়ারি ০৪, ২০২০।*

মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গ সোনাহাট ব্রিজ

রিফাত নাহার দিশা

শীত আসি আসি ভাব বইছে কিন্তু এখনো আসেনি, ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল একটু ঢাকার বাহিরে ঘুরে আসার। কোভিট ১৯ -এর কারণে ঘর হতে বের হওয়া এক রকম ভুলেই গিয়েছিলাম। পরিবেশ কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর একদিন আম্মু বলল, চলো কুড়িগ্রাম থেকে ঘুরে আসি। কুড়িগ্রামের নামটি কানে আসতেই মনে পড়ল আমার নানাভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম শাহ্ আলাউদ্দিনের স্মৃতির ডাইরির কথা। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতের সাথে যোগাযোগে মুক্তিযোদ্ধারা ও মিত্রবাহিনীর ব্যবহৃত সেই বঙ্গ সোনাহাট ব্রিজের কথা, সেই সাথে আরো অনেক কিছু। আমি রাজি হয়ে গেলাম কুড়িগ্রাম যাওয়ার জন্য । স্বাস্থ্যবিধি মেনে একদিন সকালে কুড়িগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

দিনটি ছিল শুক্রবার। সকাল সকাল উঠে তৈরি হয়ে বাসে করে যাত্রা শুরু করলাম। সেদিন একটু রোদ উঠেছিল, যে রোদ চারিদিক ঝলমল করে নিজের উপস্থিতির জানান দেয় কিন্তু নিজের কঠোর তাপকে আড়ালে রেখে আসে। খুবই ফুরফুরে মেজাজে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। ঢাকা থেকে কিছুটা যেতেই দেখলাম গেরস্ত ঘরের গবাদি পশুগুলো নতুন শীতের পোশাক পরে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে। কুয়াশায় ঢাকা অস্পষ্ট শীত মাখানো ভোরের স্নিগ্ধ আলোর মধ্যেই গাড়ি হুরহুর করে ছুটে গেল।

আস্তে আস্তে রোদ কঠোর রূপ নিতে শুরু করল। পথের দুধারেই ধানক্ষেত, কোথাও পাকা ধান, কোথাও সোনালি ধান মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দূর দিগন্তে সবুজ বনানী আর পাকা ধানের সোনালি আভা রং ছড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।

আমরা রাত ৯ টার দিকে কুড়িগ্রাম পৌঁছলাম। খুবই ছিমছাম শহর। মনে হয় সেখানকার মানুষ খুবই যত্নের সাথে এই শহরকে আগলে রেখেছে। আমরা রাতের খাবার সেখানকার বিখ্যাত বৈরালি মাছ দিয়ে করলাম। সাথে আরো নানা খাবার ছিল কিন্তু এই মাছটি যেন নদীর স্বাদ নিজের মধ্যে বহন করে এনেছিল। রাতে খাবার পর আমরা ধরলা নদীর তীরে

কিছু সময় কাটালাম। কুড়িগ্রামকে যদি একটি বিশেষণ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়, তাহলে আমি বলব নদীর শহর। এখানে ৪টি আন্তর্জাতিক নদী ছাড়াও ১৬টি নদী আছে। ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তিস্তা ও দুধকুমার ছাড়া ছোটো ছোটো নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ফুলকুমার, সোনাভারি, নীলকমল, জলচিরা, ধরনী, ছলছলিয়া ইত্যাদি। মনে হয় মানুষজন খুবই আয়েশ এবং শখ করে নদীগুলোর নাম রেখেছেন।

ধরলা নদীর পাশ থেকে ঘুরে আমরা গেলাম সাবেক জেলা প্রশাসক মোছাঃ সুলতানা পারভীনের উদ্যোগে তৈরিকৃত একটি চমৎকার সরোবর। রাতের বেলায় সবগুলো লাইট জালানো দেখে আম্মুকে জিজ্ঞেস করলাম 'এত লাইট জ্বালিয়ে রাখলে বিদ্যুতের অপচয় হয় না?' সেখানকার একজন বললেন 'এসব সোলার লাইট' শুনে অবাকই হয়েছিলাম। রাতের অন্ধকারে সেই সুসজ্জিত লাইটগুলোই সরোবরটাকে ভীষণভাবে জীবন্ত করে রেখেছে। সরোবরের চারপাশে রাস্তা যা দেখতে খুবই মনোরম। রাস্তার চারপাশে বড়ো বড়ো গাছ। তার নিচে ছোটো ছোটো নতুন গাছ। মনে হচ্ছিল যেন মা গাছগুলো বাচ্চাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে সুন্দর রাস্তা, মাঝখানে টলমল পানি, মা ও বাচ্চাগাছ এই অপরূপ দৃশ্য যেন আমায় ডাকছিল তাদের সাথে মিশে যেতে। আর সোলার লাইটগুলো আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার আরো থ াকতে ইচ্ছে করছিল তাদের সাথে কিন্তু রাত অনেক হয়ে গেছে আর আমাদেরও রুমে ফিরতে হবে। শরীরটাও আরামদায়ক ক্লান্তিতে ভরে উঠেছিল। সানন্দে লেপের ভিতর ঢুকে পরলাম। ঘুমুতেও বেশ একটা সময় লাগল না।

পরদিন সকাল সকাল নাশতা করে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম। আম্মুর অফিসের কাজেই কুড়িগ্রামে যাওয়া। কাজ শেষ করেই রওনা দিলাম সোনাহাট স্থল বন্দরের উদ্দেশ্যে। কুড়িগ্রাম শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় সোনাহাট স্থল বন্দর অবস্থিত। সোনাহাট স্থল বন্দর যাওয়ার পথে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল আরো একটি আকর্ষণ, সেটি হলো দুধকুমার নদী। দুধের উপর সর যেভাবে পড়ে সেভাবেই দুধকুমার নদীর উপর চর পড়েছিল। সুন্দর এই নদীটি তিস্তা নদীরই একটি শাখা। কিছুটা দুষ্টু বলেই তিস্তার হাত ছেড়ে একাই অচীন গন্তব্যে ছুটে চলছে। দুধকুমার নদীর উপর বঙ্গ সোনাহাট ব্রিজ যা পাটেশ্বরী ব্রিজ বলে পরিচিত। আমার নানা ভাইয়ের শিহরণ জাগানো স্মৃতির পাতা থেকে বলা গল্পের সেই স্বপ্নের ব্রিজ। ব্রিজটি ব্রিটিশরা স্থাপন করে গিয়েছিল।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় দুধকুমার নদীর ওপারে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর ক্যাম্প ছিল। সেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণের জন্য নদীপথে গমণ করতেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেন ব্রিজ পার হয়ে ট্যাংক, গাড়ি না আনতে পারে তাই মুক্তিযোদ্ধারা ব্রিজটি মাঝখান দিয়ে ভেঙে দেন। আমাদের কাছে পাকিস্তানিদের মতো অস্ত্র, গুলি না থাকলেও যুদ্ধ করার জন্য শ্রেষ্ঠ কৌশল ও সাহস ছিল। যা আমাদেরকে বিজয়ের পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গ সোনাহাট ব্রিজও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অতন্দ্র সৈনিক হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল। ঐতিহাসিক ব্রিজ পেরিয়ে পৌঁছলাম সোনাহাট স্থল বন্দরে। ১৭ ই নভেম্বর এটি উদ্‌বোধন হয়।

স্থল বন্দরটি ভারতের আসাম এবং পশ্চিম বঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, যা ভারতের সাথে সাত বোন বলে খ্যাত অঙ্গরাজ্যের গেটওয়ে হিসেবে কাজ করছে। এই স্থল বন্দর দিয়ে প্রতিদিন পাথর, কয়লা, তাজা ফল, ভুট্টা, পিঁয়াজ, রসুন, গম ইত্যাদি জিনিস আমদানি করার অনুমতি রয়েছে এবং নিষিদ্ধ পণ্য ব্যতীত বাংলাদেশি সব পণ্য রপ্তানির অনুমতি রয়েছে।

যখন আমরা বর্ডারের একদম কাছে পৌঁছলাম তখন বর্ডারের এপার এবং ওপারের দৃশ্য একই হলেও আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমার বাংলার স্নিগ্ধতাই অনেক বেশি। দেশের অগ্রযাত্রায় একটি স্থল বন্দরের গুরুত্বটাকে আমি খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছি।

সেদিন রাতেই বাসে করে ঢাকায় ফিরেছি। সব কিছু ভীষণভাবে মনে পড়ছিল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে পাটেশ্বরী ব্রিজের কথা, অনেক নদী, দেশের অগ্রযাত্রার অন্যতম দ্বার সোনাহাট স্থল বন্দর, স্নিগ্ধ শহর, সবকিছুই অনেক অনেক ভালো লেগেছে। ■

দ্বাদশ শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস্ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

আবদুল্লাহ আল মুকিত, ১ম শ্রেণি, বাইতুল হিকমা মাদ্রাসা, আশুলিয়া, সাভার

ছোটোদের লেখা

রক্ত দিয়ে তৈরি

সারাফ নাওয়ার

অরণ্যে ঘেরা ছোট্ট গ্রাম। আঁকাবাঁকা পথ। পথের ধারে সারি সারি গাছ। গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে নদী। রাতের বেলায় চাঁদের আলোয় নদীর সৌন্দর্য স্বর্গীয় হয়ে ওঠে।

দুরন্ত কিশোর রাজু। খেলতে খুব ভালোবাসে। পড়াশোনায় মন নেই বললেই চলে। স্কুলে গেলে ছুটির ঘণ্টা শোনার অপেক্ষায় থাকে। বাড়ি ফেরার পথে কখনো রহিম চাচার বাগানে চুরি,কখনো আবার ফজল চাচার ক্ষেতের শসা চুরি করে খায়। প্রতিদিনই বাড়িতে বিচার আসে। মা - বাবা তো অস্থির ছেলেকে নিয়ে। তাদের বাড়িটা বাজারের কাছে। গাছগাছালিতে ভরা। ছনের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘর। মা-বাবা আর ভাই-বোনের সংসার। রাজুর ছোটো বোন রিয়া। সাত বছর বয়স। ভাই-বোনের খুব ভাব। এভাবেই দুষ্টুমি আর আনন্দে তাদের দিন কেটে যায়।

১৯৭১ সাল। ২৮শে মার্চ। স্কুল থেকে ফেরার পথে রাজু লোকমুখে শুনেছে মিলিটারি এসেছে। দু-একদিন পর স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। একদিন বন্ধুদের নিয়ে খেলতে গিয়ে দেখল মিলিটারি রহমত চাচার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। যাকে পাচ্ছে গুলি করে মারছে। তিন দিন পর খবর এল প্রিয় বন্ধু শাহাদাতকে গুলি করেছে মিলিটারি। সপ্তাহখানেক পর শাহাবুদ্দিন চাচাকে ধরে নিয়ে গেল তারা। এভাবে পরিচিত মানুষগুলোকে প্রাণ হারাতে দেখে রাজুর চোখে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। রাজু মনে মনে ঠিক করল যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিবে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিবে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বাড়ি থেকে বেরোনো বারণ। তবু সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ভোর বেলা বেরিয়ে এল রাজু। গ্রামের পশ্চিম দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। ক্যাম্পে গিয়ে অন্যান্য কিশোরদের সাথে সেও প্রশিক্ষণ নিতে যোগ দিলো। এদিকে বাড়িতে হৈচৈ পড়ে গেছে। রাজুকে পাওয়া যাচ্ছে না। মায়ের কান্নায় পরিবেশ ভারি হয়ে গেছে। বাবা খুঁজতে গেছে রাজুকে। হঠাৎ গুলির শব্দ। কিছু বোঝার আগেই লুটিয়ে পড়ে বাবা। রাজু খবর পায়। জেদটা যেন দ্বিগুণ হয়ে যায় তার। পাকিস্তানিদের যোগ্য জবাব দেবেই সে। মায়ের মনটা আরও খারাপ হয়ে যায়। রিয়া কিছু বোঝে না। মাকে কেবল জিজ্ঞেস করে, 'বাবার কী হয়েছে।

ভাই ফিরছে না কেন?' মা উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু ভাই ছাড়া রিয়ার এক মুহূর্তও চলে না। সে একই প্রশ্ন করে প্রতিদিন। মা একদিন বলে, 'যারা তোর বাবাকে মেরেছে তাদের শাস্তি দিতে গেছে রাজু। দেশের শান্তি ফেরাতে গেছে তোর ভাই।' রিয়া আর প্রশ্ন করে না। কথাগুলো কঠিন মনে হয়। তবুও বুঝতে চেষ্টা করে।

রাজুরা একদিন ঠিক করে গ্রামের বড়ো ব্রিজটা উড়িয়ে দেবে। ব্রিজের ওপারে পাকিস্তানিদের একটা ক্যাম্প। অন্যটা বাজারের কাছে। ব্রিজটা উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে তারা। এবার অন্য ক্যাম্পটা ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছে তারা। মাঝে মাঝে রাজুর সাথে কয়েকজন সহযোদ্ধা রাজুদের বাসায় গিয়ে ভাত খায়। রিয়া এখন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক কিছু বোঝে। রাজু ওকে বুঝিয়েছে,'দেশের মানুষ আমাদের আপনজন। এটা দেশের মানুষের জন্য যুদ্ধ। কাছের মানুষগুলোকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার যুদ্ধ।' রাজু যখন এসব কথা বলে তখন মা অবাক হয়ে যায়। যে ছেলে এত দুষ্টুমি করে সে এত কিছু বোঝে কীভাবে। রাজু মাকে কথা দিয়েছে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত যুদ্ধ করবে।

একদিন মা অসুস্থ হওয়ায় রিয়া নদীতে পানি আনতে গেল। পানি নিয়ে ফেরার পথে সে দেখল ভীষণভাবে গোলাগুলি হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা আর পাকিস্তানিদের মধ্যে। রিয়া আড়াল থেকে দেখছিল যুদ্ধ কেমন হয়। হঠাৎ একটা গুলি এসে বিঁধল রাজুর বুকে। সে জয় বাংলা বলে লুটিয়ে পড়ল। পানির জন্য ছটফট করছিল। রিয়া কলসি ভর্তি পানি নিয়ে দৌড়ে ভাইয়ের কাছে যায়। নৃশংস পাকিস্তানিরা তাকেও ছাড়েনি। গুলি চালিয়ে দেয়। ভাইয়ের পাশে রিয়ার নিথর দেহ পড়ে থাকে। রক্তে ভরে গেছে চারদিক। যেন রক্তের বন্যা। এই রক্তের বিনিময়ে এসেছে স্বাধীনতা। আমাদের জাতীয় পতাকার লাল রং যেন অজস্র রিয়া-রাজুর রক্ত দিয়ে তৈরি। ■

দশম শ্রেণি,কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার

করোনার ভয় হবেই জয়

সাবিত্রী রাণী

বাঙালি মোরা বীরের জাতি
করি না কিছুতে ভয়।
যতই আসুক বাধা-বিপত্তি
করব সবই জয়।

ইতিহাসে লেখা আছে
আমাদের বীরত্ব গাথা।
কোনো কিছুতে পিছপা হইনি
দাঁড়িয়েছি উঁচু করে মাথা।

কত শত্রুর মোকাবিলা করেছি
কাটিয়েছি বড়ো বড়ো বিপর্যয়।
করোনাও একদিন থমকে দাঁড়াবে
আমাদের হবেই জয়।

করোনায় করণীয়

বেগম দিলরুবা খালিদা আমিন

বিশ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নাও,
বাইরে বের হলে মাস্ক পরে যাও।

তিন ফুট দূরে থাকো, কাছে বসো না,
জীবাণুমুক্ত ঘর-বাড়ি, ভুলে যেও না।

হাঁচি, কাশি হলে পরে সাবধান থাকো,
ঘরে বসে বন্দি হও বাইরে যেও নাকো।

বাবা মায়ের কাছে থেকে দিন করো পার,
খেলাধুলা পড়াশুনা ঘরে দিনভর।

কাঁচামরিচ, পাতিলেবু পানি বেশি খাবে,
মুখে, চোখে, নাকে, কানে হাত না লাগাবে।

শ্বাস নাও জোরে জোরে আরাম পাবে তাতে,
শাকসবজি বেশি খাও থাকবে তফাতে।

গোলমাল খুনসুটি কভু করো না,
করোনাকে জয় করো, ভয় পেও না।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম কিশোর শহিদ

শামস সাইদ

বাঙালির সব অর্জনেই সব শ্রেণি পেশা ও বয়সের মানুষের সম্পৃক্ততা রয়েছে। ১৯৫২ সালে আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনেও সব শ্রেণির মানুষ রাজপথে নেমে এসেছিল। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধেও সর্বস্তরের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নয় মাসব্যাপী এ যুদ্ধে অনেক রক্ত, ত্যাগ, তিতিক্ষার পর আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এই যুদ্ধে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা যেমন অংশগ্রহণ করেছিল তেমনি অংশগ্রহণ করেছিল শিশু-কিশোররাও। তারা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, মুক্তিযুদ্ধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রায় ৪ লাখই ছিল শিশু-কিশোর। আর যে- সব নারী সম্ভ্রম হারিয়েছিল তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছিল কিশোরী। তাই মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে শিশু-কিশোরদের অবদান কিছুতেই খাটো করে দেখার নয়।

মুক্তিযুদ্ধে বড়োদের সঙ্গে মাঠে নেমেছিল শিশুরাও। রাতের আঁধারে অথবা প্রয়োজনীয় যে-কোনো মুহূর্তে এক ক্যাম্পের খবর অন্য ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়েছে আমাদের দেশের দুরন্ত শিশুরা। তারা গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে খাবার সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছে। বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের গুপ্তচর হয়ে পাকিস্তানি শিবিরে ঢুকে সংবাদ বা যে-কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য মুক্তিযোদ্ধাদের জানিয়েছে। পাকিস্তানি হানাদারদের ভুল রাস্তা দেখিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে থেকে গোলাবারুদ ও অস্ত্র সরবরাহ করাসহ যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে বেড়ানোসহ মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য ছোটো খাটো কাজ করেছে শিশু-কিশোররা। স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল রক্তক্ষয়ী ও দীর্ঘদিনের। শিশু-কিশোরা এ সময় কখনও কখনও বড়োদের মতো যুদ্ধ করেছে। উড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্প। শিশু-কিশোরদের যেমন বিজয়ের ঘটনা আছে তেমনি আছে শহিদ হওয়ার ঘটনাও। অনেকে গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের খবর আনা-নেয়া করতে করতে কোনোদিন আর ফিরে আসেনি। তার লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদও হয়েছিল শংকু নামের এক কিশোর। শংকু রংপুরের ছেলে। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ সারাদেশের মধ্যে রংপুরে প্রথম শহিদ হয় ১২ বছরের এই কিশোর শংকু সমঝদার। ৩রা মার্চ সারাদেশের মতো রংপুরেও হরতাল পালিত হয়। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হরতাল পালন করে। মিছিলে ছিল গগনবিদারী শ্লোগান 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব-শেখ মুজিব'। মিছিলটি স্টেশন রোড অভিমুখে তেঁতুল তলায় (শাপলা চত্বর) যাচ্ছিল। মিছিলের অগ্রভাগ যখন খাদ্য গুদামের কাছে পৌঁছেছে তখন উর্দুতে লেখা একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ে শংকুর। সেটা ভাঙতে শুরু করে। তার সাথে হাত লাগায় আরও কয়েকজন। এই সময় অবাঙালি সরফরাজ খানের বাড়ি থেকে এলোপাতাড়ি গুলি ছুটে আসে।

এতে নিহত হয় গুপ্তপাড়া এলাকার ১২ বছর বয়সের শংকু সমঝদার। আহত হয় আরো কয়েকজন। শংকুর মারা যাওয়ার খবরে উত্তেজিত হয়ে উঠে জনতা। এক পর্যায়ে তারা গোটা শহরে অবাঙালিদের দোকানে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায়। ইতোমধ্যে অবাঙালিদের গুলিতে আরো দুজন প্রাণ হারান। কিশোর শংকুসহ অপর দুজনের প্রাণ দানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় রংপুরের মুক্তিযুদ্ধ।

বিচ্ছিন্নভাবে শিশু-কিশোরদের সারাদেশে এমন অনেক অনেক ঘটনা আছে যা দেশ স্বাধীন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কামরুল হাসান ভূঁইয়ার লেখা থেকে আরো জানা যায়– ক্লাস ফোর ফাইভের ছাত্ররা যুদ্ধে এসেছিল। দু-চোখ ভরা তাদের দুষ্টুমি। এদের জায়গা ওয়াই প্লাটুনে হলেও লালমাটিয়ার আবদুল আজীজের (বীর প্রতীক, ১০ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে প্রয়াত) সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ওদের ন্যস্ত করা হয়, ট্রেনিংয়ের দায়িত্বসহ।

আবদুল আজীজ এই শিশুদের আপন ভাইয়ের চেয়ে বেশি স্নেহ করতেন। ভারতের এই ক্যাম্পে এই শিশুদের কোনো আপনজন ছিল না। এরা ছিল আবদুল আজীজের প্রচণ্ড ভক্ত। এদের মধ্যে ঢাকার গ্রিন রোডের হাসান, প্রদীপ, শাহজাহান ছিল উল্লেখযোগ্য। অনেকে আদর করে এদের নাম দিয়েছিলেন 'ওয়াকিটকি'।

ফটোগ্রাফার রশীদ তালুকদার একটি প্রতিবেদনে বলেছিলেন, 'পেছনে আবছা দেখা যাচ্ছে আয়ুব খানের গলায় জুতার মালা। কোত্থকে সামনে ছেলেটা এসে স্লোগান দিতে শুরু করল। ছবিটা তুলে উঠে দাঁড়াতে যাব, তখনই গুলি এসে লাগল ছেলেটার গায়ে। ঘটনাটা এমন আকস্মিক ছিল, গুলিবিদ্ধ ছেলেটার ছবি তুলতেও ভুলে গিয়েছিলাম। ছবিটিতে মিছিলে বড়োদের থেকে শিশুদের সংখ্যাই ছিল বেশি।'

চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'ওরা ১১ জন', তারেক মাসুদ পরিচালিত 'মুক্তির গান' এবং মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত 'আমার বন্ধু রাশেদ' চলচ্চিত্রে দেখা গেছে মুক্তিযুদ্ধে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণের চিত্র। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস ও নাটকের মাধ্যমে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণের কথা। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

এস.এম রেহাম রামিন, ১ম শ্রেণি, হাসিব ড্রিম স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুষ্টিয়া

বোকা কমান্ডার

আরিফুল ইসলাম সাকিব

ছোটো একটি বাগান। বাগানে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা নানা রকমের ফল গাছ রয়েছে। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে আঁকাবাঁকা নদী। নদীর পাশেই সবুজঘেরা ছোটো একটি গ্রাম। গ্রামে একটি স্কুলও রয়েছে।

এই গ্রামেই ছিল সহজ সরল রহিম মিয়ার বাস। গ্রামের বাগানটি ছিল তার। প্রতিবছর অনেকফল ধরে বাগানের গাছগুলোতে। বাগানটি ছিল তার একমাত্র আয়ের উৎস।

১৯৭১ সাল। দেশে যুদ্ধ লেগেছে। ঢাকায় গোলাগুলি হয়েছে।

অনেক মানুষ মারা গিয়েছে। সরকার পাকিস্তান থেকে অগণিত সৈন্যসেনা অস্ত্রসহ পাঠাচ্ছে। গোলাগুলি দিনকে দিন বাড়তে থাকে। কিছুদিন

পর রহিম মিয়ার গ্রামেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি ঢুকলো। হানাদার বাহিনি স্কুলেই ক্যাম্প তৈরি করল। গ্রামের সবার মনে আতঙ্ক। তাদের বিশ্বাস, কেউ আর প্রাণে বাঁচতে পারবে না। পলাশ ছিল সেই গ্রামের নামকরা দুষ্টু ছেলে।

একদিন বর্বর হানাদার বাহিনির কমান্ডার কয়েকজন সৈন্য নিয়ে বাগানে এল। গাছে পাকা-পাকা সুস্বাদু ফল দেখে জিভে পানি চলে আসে। কাউকে কিছু না বলেই লিচু গাছ থেকে লিচু ছিঁড়ে খাওয়া শুরু করে দেয়। এভাবে নানা ফল খেতে থাকে। রহিম মিয়া এ দৃশ্য দেখে ভয়ে চুপচাপ রইল। প্রাণের ভয়ে কিছু বলার সাহস পায় না। মনে মনে ভাবে, বলা তো যায় না! কখন কাকে ধরে জনমের মতো শেষ করে দেয়। এভাবে রোজ-রোজ এসে বাগান থেকে যা ইচ্ছে খেয়ে যায়। খাওয়া শেষে অনেকগুলো সাথে নিয়ে যায়। রহিম মিয়া খুব চিন্তিত। গ্রামের কয়েকজন লোককে জানাল। ভয়ে কেউ কিছু বলল না। রহিম মিয়া একদিন আনমনে ভাবছে, কদিন ধরে বাগানে পলাশও আসছে না। হয়ত হানাদার বাহিনির কথা শুনেই আসছে না।

পলাশ, রহিম মিয়াকে চাচা বলে ডাকে। রোজ এসে রহিম চাচার সাথে কাজ করতো আর ফল খেত। একদিন পলাশ জানতে পারলো, বাগানের সব ফল হানাদার বাহিনি খেয়ে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে। বিকেলবেলা সে রহিম চাচার বাড়ি গেল। পলাশকে দেখেই অবাক রহিম মিয়া!

-তুই এ কদিন কোথায় ছিলি? জানিস হানাদার বাহিনীরা বাগানের প্রায় সব লিচু খেয়ে ফেলছে। এ বছর হয়ত আর লিচু বিক্রি করতে পারব না।

পলাশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একটা বুদ্ধি তো বের করতেই হবে। লিচুও বিক্রি করতে হবে।

-হানাদার বাহিনির কথা শুনেছিস। যাকে ধরে একদম মেরে ফেলে। কি করি বল?

পলাশ, রহিম চাচাকে অনেকক্ষণ বুঝাল। তারপর লিচু বিক্রি করতে রাজি হলো। সাত-সকালে লিচু পারতে যায় দুজন। এ কথা বর্বর হানাদার বাহিনির কানে পৌঁছাতেই, কজন সৈন্য এসে রহিম মিয়াকে ধমকাতে শুরু করল। লিচু যা পেড়েছিল সব নিয়ে যায়। আর বলে গেল, গাছ থেকে লিচু পারলে হাত-পা বেঁধে স্যারের (কমান্ডার) কাছে নিয়ে যাবো। স্যারের মেজাজ খুবই গরম। কখন কি করে বলা যায় না। কি আর করার! দুজন এককোণে চুপচুপ বসে রইল। পলাশ মনে মনে ভাবে, কিছু একটা করতেই হবে। সেদিন দুজন বাড়ি ফিরে গেল।

পরের দিন বিকেলবেলা বাগানে হানাদার বাহিনির কমান্ডার সাথে কিছু সৈন্যরাও এল। বাগানের এককোণে ছিল এক আমগাছ। তরতাজা লাল-টুকটুকে আমগুলো কেউ পারত না। কারণ পাশেই ছিল বিষাক্ত ভিমরুলের বাসা। তাই ভয়ে কেউ গাছের আশপাশেও যায় না। কমান্ডার গিয়ে ওই গাছ থেকে আম পাড়া শুরু করলো। একটা পেড়ে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে খাচ্ছিল। আরেকজন সৈন্য গিয়ে আরেকটি আম পাড়ছিল। সাথেই সাথেই বিষাক্ত ভিমরুল এসে কামড় বসিয়ে দেয়। এভাবে ভিমরুলগুলো ভন ভন করে সৈন্যদের কামড়ানো শুরু করে। আর যে যার মতো দৌড়ে পালালো।

সন্ধ্যায় দুষ্টু পলাশ তাদের দেখতে যায়। সবাই তো ওর উপর খেপে গেল। পলাশ সুন্দর করে তাদের বুঝিয়ে বিষাক্ত জাগায় চুন লাগিয়ে দেয়। পলাশকে এভাবে সেবা করতে দেখে সৈন্যরা সবাই খুশি হলো। সকালবেলা কমান্ডার পলাশকে ডেকে এনে আবার চুন মালিশ করে নিল।

পাকিস্তানি কমান্ডার ছিল পেটুক স্বভাবের লোক। সারাদিন খাই খাই করে। লোভ সামলাতে না পেরে পরেরদিন আবার গেল বাগানে। এবার কাঠাঁলপাকা ঘ্রাণে মাতাল হয়ে গেল। জোর পূর্বক পলাশকে গাছে তুলে দিল। গাছে উঠে দেখল একটি কাঁঠাল পেকে একদম নরম হয়ে আছে। উপর থেকে নিচে ফেললে ফেটে যাবে। তাই কমান্ডারকে বলল,

-স্যার, কাঁঠাল ক্যাচ ধরতে হবে। নরম কাঁঠাল সরাসরি মাটিতে পড়লে ফেটে যাবে।

পলাশের কথায় কমান্ডার রাজি হলো। কাঁঠাল ক্যাচ ধরবে। পশাল, উপর থেকে ছাড়লো...কাঁঠাল হাতে না পড়ে নিচে পড়ে ফেটে ছন্নছাড়া হয়ে গেল। তা দেখে পলাশ মিটমিট হাসছে!

কমান্ডারের অবস্থা দেখে পলাশ বলল- স্যার, এখান থেকে কাঁঠাল নিয়ে যেতে পারেন। একরাত রাখলেই পেকে যাবে। সবাই মিলে খেতে পারবেন।

পলাশ কাঁঠাল নিয়ে কমান্ডারের সাথে গেল। কাঁঠাল দেখে সৈন্যেরা খুব খুশি। একজন পলাশকে জিজ্ঞাস করল,কখন পাকবে? উত্তরে পলাশ বলে, কালকেই খেতে পারবেন। কমান্ডার বলল, কাল বিকালে তুই চলে আসবি। সবাই একসাথে কাঁঠাল খাবো।

পরের দিন বিকেলবেলা পলাশ গেল। কাঁঠাল ভাঙল। সবাই একসাথে খাওয়া শেষ করলো। সবার হাতে কাঁঠালের কষ লেগে যায়। এমতাবস্থায় কাঁঠালের কষ ছাড়াতে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দুষ্টু পলাশ বুদ্ধি দিল। স্কুলের পেছনে একটা গাছ আছে। ওইগাছের পাতা দিয়ে ডলা দিলেই চলে যাবে। বোকা কমান্ডার আদেশ দিলো বেশি করে পাতা নিয়ে আসার জন্য। এদিকে পলাশ চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে এল। সৈন্যরা বেশি করে বিছুটি গাছের পাতা নিয়ে আসে। সবাই বিছুটি পাতা দিয়ে হাত ডলা শুরু করলো। একটু পরেই চুলকানি শুরু হয়। চুলকাতে চুলকাতে সবার হাত ফুলে কলাগাছ। সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই। পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যের রক্তিম আভা।

এ সুযোগে পলাশ গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খবর দেয়। রাতে স্কুলে গোলাগুলির শব্দ শুনা যায়। আর এক রাতেই সব হানাদার বাহিনি খতম। পলাশকে, মুক্তিযোদ্ধারা স্যালুট জানায়। গ্রামের সবাই পলাশের এমন সাহসী কাজে গর্ব করে। রহিম চাচারও ফল বিক্রিতে কোনো চিন্তা থাকে না। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

সবুজ শ্যামল দেশ

মঈনুল হক চৌধুরী

সবুজ শ্যামল পটে আঁকা
আমার এ দেশ ভাই,
পাখপাখালির গানে ভরা
রূপের তো শেষ নাই।

নীল আকাশে মেঘের ভেলা
ছন্দ তোলে নদী,
পাহাড় মাঝে ঝরনাধারা
বয় যে নিরবধি।

সবুজ শ্যামল এদেশ নিয়ে
আমার অনেক মায়া,
দেশটা আমার মা জননী
মাথার উপর ছায়া।

বিজয় গাথা

মো. কামাল শেখ

বীর বাঙালির বিজয় গাথা
তাঁর মহিমায় সমুজ্জ্বল;
ছন্দ-ছড়া গল্প-কথা
মুজিব নামে নীলোৎপল।

দীপ্ত তেজি তর্জনী তাঁর
বজ্র কঠিন ঐ বাণী;
ঘুচিয়ে দিলো বাংলা মায়ের
শিকল পরা সেই গ্লানি।

মুজিব সে তো মুক্তি আমার
মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ;
ভিন বেনিয়ন পাক হায়েনার
দখলদারীর গর্ব শেষ।

নয় সে নেতা আম জনতার
বন্ধু অতি আপনজন;
তাই তো আজও হৃদয় হতে
মুজিব নামে বিচ্ছুরণ।

কেমন ছিল সেই দিন

শাহানা আফরোজ

দিনটি ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন। শীতের দিনে পাকিস্তানি ঘাতকবাহিনী সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে হেঁট মস্তকে দাঁড়িয়ে ছিল বীর বাঙালির কাছে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। অর্জিত হয়েছিল চিরগৌরবের মহান বিজয়। আজো তা লাল-সবুজের উৎসবের দিন।

সেদিন একদিকে ছিল বিজয় উল্লাস, অন্যদিকে প্রিয়জন হারানোর বেদনা। একদিকে দেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দ, অন্যদিকে প্রিয়জনের মরদেহের সন্ধান। একাত্তরের অনেক দুশ্চিন্তার রাত কাটানোর পর সেই রাতে যেন অবশেষে একটু স্বস্তিতে ঘুমিয়েছিল সারাদেশের মানুষ। আকাশ ভরা জোছনা নিয়ে সেই রাতে চাঁদ উঠেছিল। চাঁদ উঠেছিল বাঙালির মনে, ঘরে-ঘরে। আগের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর তারও আগের অনেক অনেক বছরের সংগ্রামের ইতিহাসে ইতি টেনেছিল সেই বিজয়। বিজয়ের খবর যেন প্রশান্তির ধারা এনে দিয়েছিল সবার মনে। বাংলার প্রতিটি মানুষ বেদনার মধ্যে দিয়ে আনন্দ পেয়েছিল। তবে সেই সময়ের অনভূতি এখন কাউকে বোঝানোর মতো না।

সেই দিন ও রাতটির কথা মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের ১০ম খণ্ডে উঠে এসেছে এভাবে: 'মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যদের রাজধানীতে প্রবেশের খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। উল্লাসের জোয়ারে লক্ষ লক্ষ লোক নেমে আসে রাস্তায়। জনমানববিহীন নিঃশব্দ নগরী মুহূর্তে ভরে উঠে মানুষের বিজয় উল্লাসে। ওরা এসেছে এই বাণী উচ্চারিত হতে থাকে মানুষের মুখে মুখে। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনি উঠে জয় বাংলা। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। যৌথ বাহিনীর জন্য মানুষ এগিয়ে আসে ফুলের ডালি নিয়ে হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা নিয়ে।' সেই দিনের আরো কিছু সময়ের বর্ণনা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে বিজয় মুহূর্ত নিয়ে লেখা হয়েছিল এভাবে– বিজয়ের মধ্যে দিয়ে নয় মাসের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটল। বাংলার মানুষ আবার তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার পেলো। পথে-প্রান্তরে, পর্বতাঞ্চলে নদ-নদী-খালে-বিলে বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে বাঙালি আবার নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে। ছায়ার মতো অনুসারী মৃত্যুর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে হবে না। আর রাতের অন্ধকারে প্রতিটি অচেনা শব্দ মৃত্যুর অশুভ পদধ্বনি হয়ে আসবে না। চারদিকে আনন্দ আর উল্লাসের ঢেউ জীবনে। পাকিস্তানী সেনাদের ভয়ে এর আগে কারো বাড়িতে

লাইটও জ্বালাতে না। এদিন যেন আবার আলোকজ্জ্বল হয়ে উঠলো বাড়িগুলো। সেদিন চারদিকে শুধু জয় বাংলা স্লোগান। অনেকদিন পর মানুষ যেন সেদিন রাতে নির্বিঘ্নে ঘুমালো। কোনো কিছু হারানোর ভয় ছাড়া শান্তির এক ঘুম।

রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত প্রথম বিজয় দিবস

প্রতিবছর বিজয় দিবস বাংলাদেশে বিশেষ দিন হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের সর্বত্র পালন করা হয়। ৯ মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রায় ৯৪,০০০ সদস্য বাংলাদেশ ও ভারতের সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এর ফলে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭২ সালের ২২শে জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনে এই দিনটিকে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হিসেবে এবং সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

পরের বছর ১৯৭২ সালে বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রথম বিজয় দিবস উদযাপিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ ও প্রবীণ ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে কথা বলে প্রথম বিজয় দিবস সম্পর্কে জানা গেছে অবাক হওয়ার মতো অনেক তথ্য। এবার তোমাদের জানাব সেইসব অজানা কথা।

সংবিধান কার্যকর, সুপ্রীমকোর্ট চালুর বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করাসহ বেশকিছু কারণে ১৯৭২ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর ছিল ঐতিহাসিক। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ শেষে দেশ যেদিন শত্রুমুক্ত হলো সেদিন বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। '৭২ সালের বিজয় দিবসে তাঁর উপস্থিতি রাষ্ট্রীয় আয়োজনকে পূর্ণতা দেয়। তাঁকে কেন্দ্রে রেখেই চলে উৎসব প্রস্তুতি। বর্তমানের বিজয় উৎসবগুলো সেদিনের আয়োজনটিকেই অনুসরণ করে চলেছে। জানা যায়, ১৯৭২ সালের এই দিনের সবচেয়ে বড়ো এবং ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হওয়া। ঐ বছরের ৪ঠা নভেম্বর জাতীয় সংসদে এ সংবিধান গৃহীত হয়। বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকীর দিন এটি কার্যকর করা হয়।

দিবসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো বাংলাদেশের

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পুনরায় শপথ গ্রহণ। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল ঘোষিত স্বাধীনতার সনদ ছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের মৌলিক আইনের প্রধান ভিত্তি। তখন এটিই ছিল সংবিধান। অস্থায়ী সংবিধানের আওতায় প্রথমে রাষ্ট্রপতি করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পরে পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে দেশে ফিরে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর এর অধীনে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর একই শপথ নতুন করে নিতে হয় তাঁকে। সরকারিভাবে প্রকাশিত পাক্ষিক 'বাংলাদেশ' পত্রিকার প্রথম পাতায় এ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ছবি ছাপা হয়। বলা হয়, 'সিম্পল বাট ইম্প্রেসিভ সিরিমনি'র আয়োজন করা হয় বঙ্গভবনে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও, তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা একই নিয়মে শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন আবু সাঈদ চৌধুরী।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের জন্যও দিনটি ছিল ঐতিহাসিক। এদিন কার্যকর হওয়া সংবিধানে সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠার আইনি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংবিধানের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সুপ্রীমকোর্ট চালু করার বিধান রাখে সরকার। এর আগে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত ছিল হাইকোর্ট। এ খবরটিও খুব গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করে বিভিন্ন সংবাদপত্র। খবরে বলা হয়, হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রীমকোর্ট ১৮ই ডিসেম্বর থেকে কাজ শুরু করবে।

প্রথম বিজয় দিবসের রাষ্ট্রীয় উৎসব অনুষ্ঠান নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে ছিল ব্যাপক কৌতূহল। সরকারের পক্ষ থেকেও যতটা সম্ভব বড়ো আকারে উৎসব আয়োজন করা হয়। ২৯শে ডিসেম্বর প্রকাশিত 'বাংলাদেশ' পত্রিকা থেকে জানা যায়, ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ছিল সরকারি ছুটির দিন। এদিন ৩১ গান-সেল্যুটের মধ্য দিয়ে খুব ভোরে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে গোলাবারুদের শব্দ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, হানাদার মুক্ত বাংলাদেশে একই শব্দ মধুর হয়ে বাঙালির কানে বাজে।

তখন অত টেলিভিশন ছিল না। গ্রামে- গঞ্জে রেডিও শোনার ব্যবস্থা চালু ছিল। বাংলাদেশ বেতার সূত্রে জানা যায়, বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়ে যায় আগের রাত থেকেই। ১১১ ঘণ্টার অনুষ্ঠান প্রচার করে বাংলাদেশ বেতার। একই রকম প্রচার ছিল টেলিভিশনে। টেলিভিশনও দীর্ঘ সময় ধরে বিজয় দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

একজন ইতিহাসবিদ বলেন, 'আমার এখনও মনে আছে, ওই বিজয় দিবস নিয়ে সারাদেশের মানুষ উদ্বেলিত ছিল। খুব উত্তেজনার মধ্য দিয়ে গিয়েছি আমরা। আগেরদিন থেকেই রেডিও চালু করা ছিল। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার জাগরণী গানগুলো বাজছিল। আমরা পরদিন সকাল থেকে সারাদিন টেলিভিশনে চোখ রেখেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের গান, কবিতা, কথিকা ইত্যাদি সেদিন প্রচার করা হয়। একাত্তরের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সবার মাঝেই ছিল অদ্ভুত আবেগ। সব অনুষ্ঠানই মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেছি আমরা। ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসে গোটা জাতি ছিল ঐক্যবদ্ধ। একাত্তরের আবেগ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছিল গোটা দেশ।' ■

পতাকা

জাফরুল আহসান

বাংলাদেশের
চিরচেনা
মুক্তিসেনা
স্বপ্ন আঁকে
দুচোখ ভরে
যুদ্ধ করে
শত্রু ধরে
খতম করে;

অবশেষে
বীরের বেশে
স্বাধীন দেশে
নীল আকাশে
উড়িয়ে দিল
লাল-সবুজের
এই পতাকা।

রোকেয়া দিবস

নারী শিক্ষার অগ্রদূত

ইশরাত জাহান

বাঙালি মুসলিম সমাজের আলোকবর্তীকা হয়ে এসেছিলেন বেগম রোকেয়া। তিনি নারী শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ কারণেই আজো তিনি নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত। বেগম রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যু ৯ই ডিসেম্বর। প্রতি বছর দিনটি রোকেয়া দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

রংপুরের মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন বেগম রোকেয়া। তাঁর পিতা জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের জমিদার ছিলেন। তার মাতা রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী। রোকেয়ার দুই বোন ও তিন ভাই। বেগম রোকেয়ার পিতা আবু আলী হায়দার সাবের আরবি, উর্দু, ফারসি, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী হলেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল।

পড়াশোনার প্রতি বেগম রোকেয়ার ছিল অদম্য আগ্রহ! বড়ো বোনের কাছে তিনি বাংলা শিখতেন। রাত গভীর হলে ভাইয়ের কাছে শুরু হতো তাঁর জ্ঞানার্জন। লুকিয়ে লুকিয়েই পড়া শিখেছেন রোকেয়া। তখন মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল না, ছিল না লেখাপড়া করার সুযোগ।

পাঁচ বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় বসবাস করার সময় একজন মেম শিক্ষয়িত্রীর কাছে বেগম রোকেয়া কিছুদিন লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ ও আত্মীয়স্বজনদের নানা বঞ্চনার জন্য তাও বন্ধ করে দিতে হয়। কিন্তু রোকেয়া দমে যাননি। বড়ো ভাই-বোনদের সমর্থন ও সহায়তায় তিনি বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি এবং আরবি আয়ত্ত করেন।

১৮৯৮ সালে রোকেয়ার বিয়ে হয় সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে। তিনি ছিলেন নারী শিক্ষার পক্ষে। তাই তো মৃত্যুর আগে মেয়েদের শিক্ষার জন্য দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগিতায় বেগম রোকেয়া ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন এবং সাহিত্যচর্চাও শুরু করেন। ১৯০৯ সালের ৩রা মে সাখাওয়াৎ হোসেন মারা যান। তারপর রোকেয়ার শুরু হয় আরেক জীবন।

নানা চড়াই-উরোই পেড়িয়ে ১৯১১ সালের ১৬ ই মার্চ কলকাতার ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে তিনি সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ সালের মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা একশত পেরিয়ে যায়। স্কুল পরিচালনা ও সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রোকেয়া নিজেকে সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখেন।

সাহিত্যিক হিসেবে বেগম রোকেয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯০২ সালে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো 'মতিচূর', 'সুলতানার স্বপ্ন', 'পদ্মরাগ' পিপাসা ও 'অবরোধ-বাসিনী'। বেগম রোকেয়া ২০০৪ সালে বিবিসি বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জরিপে ষষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছিলেন। নারী জাগরণের এই পথিকৃত ১৯৩২ সালে কলকাতায় মারা গেলে তাঁকে সোদপুরে সমাহিত করা হয়। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করি নতুনভাবে টেকসই বিশ্ব গড়ি'–এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে এবারের প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়। এ বছর পালিত হয় ২৯তম আন্তর্জাতিক ও ২২তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত এ দিবসটি ১৯৯২ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী পালন করা হচ্ছে।

এ দিবসটির মূল উদ্দশ্য হচ্ছে শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা প্রদর্শন এবং তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সম্মান জানানো। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন, উপযুক্ত সেবা, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সহায়ক উপকরণ পেলে প্রতিবন্ধীরাও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা পূরণে এবং তাদের অধিকার রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে আন্তরিক হতে হবে। এবং দেশের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মেধা ও সৃজনশীলতাকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগাতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেন, প্রতিবন্ধীরা জাতির বোঝা নয়, এরা সম্পদ। সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নানাবিধ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে সরকার বদ্ধ পরিকর। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হব।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালনের পেছনের যে ঘটনাটি রয়েছে তা হলো– ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে বেলজিয়ামে খনি দুর্ঘটনায় বহু শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং প্রায় ৫ হাজারেরও বেশি শ্রমিক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। এরপর অনেক সামাজিক সংস্থা তাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কাজে এগিয়ে আসে। এর পরের বছরই আন্তঃদেশীয় স্তরে এক বিশাল সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালনের আহ্বান জানানো হয়। সে আহ্বানের সূত্র ধরেই ১৯৯২ সাল থেকে জাতিংঘের তত্ত্বাবধানে দিবসটি সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে।

দেশে প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ , নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন-২০১৮ এবং প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৯ প্রণয়ন করেছে। এ সকল আইন ও বিধি বিধানের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, ক্ষমতায়ন এবং দেশের অন্যান্য জনগণের মতো সমঅধিকার নিশ্চিতকরণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কাজেই প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে প্রতিবন্ধীরা জাতির বোঝা নয়, সম্পদ, এরাও সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ■

নিবন্ধ

সাদাত রহমান
আমাদের অহংকার

ফারুক আহমেদ খান

আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশের কিশোর সাদাত রহমান। সাইবার বুলিং ও সাইবার অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে কাজ করে 'শিশুদের নোবেল' খ্যাত এই পুরস্কার জিতে নেয় নড়াইলের ১৭ বছরের এই কিশোর।

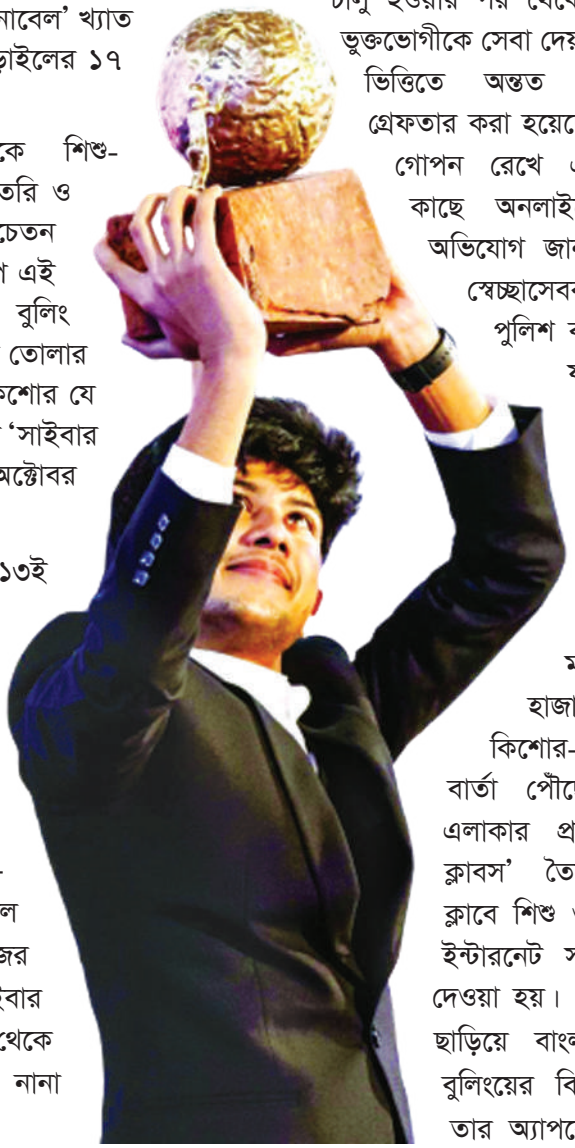

অনলাইনে হয়রানি থেকে শিশু-কিশোরদের রক্ষায় অ্যাপ তৈরি ও এর মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ এই পুরস্কার পেলেন। সাইবার বুলিং বন্ধে সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার পাশাপাশি ১৭ বছরের এ কিশোর যে অ্যাপ চালু করেছেন তার নাম 'সাইবার টিনস'। ২০১৯ সালের ৯ই অক্টোবর অ্যাপটির যাত্রা শুরু করে।

নেদারল্যান্ডসের হেগে ১৩ই নভেম্বর ২০২০ শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে সাদাতের হাতে তুলে দেওয়া হয় এই পুরস্কার। এই পুরস্কার পাওয়ার দুই বছর আগে সাদাত লাভ করেছিলেন 'জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড-২০১৮'। সাদাত নড়াইল আবদুল হাই সিটি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। তিনি সাইবার বুলিং ও সাইবার ক্রাইম থেকে শিশু-কিশোরদের রক্ষায় নানা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সাদাত রহমানের 'সাইবার টিনস' মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সাইবার বুলিং বা অনলাইনে হুমকি ও হয়রানিমূলক আচরণ সম্পর্কে শেখানো হয়। সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়ে এক কিশোরীর মৃত্যুর খবর সাদাতের হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে সেই উদ্দেশ্যেই 'সাইবার টিনস' অ্যাপ তৈরির চিন্তা মাথায় আসে তার। সাদাতের নিজ জেলা নড়াইলে ১ হাজার ৮০০ জনের বেশি কিশোর-কিশোরী বর্তমানে এই অ্যাপ ব্যবহার করছে। অ্যাপটি চালু হওয়ার পর থেকে ৩০০ জনেরও বেশি ভুক্তভোগীকে সেবা দেয়া হয়েছে । অভিযোগের ভিত্তিতে অন্তত আটজন নিপীড়ককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিচয় গোপন রেখে একদল স্বেচ্ছাসেবকের কাছে অনলাইনে হয়রানির বিষয়ে অভিযোগ জানানো যায়। পরে ওই স্বেচ্ছাসেবকরাই প্রয়োজনবোধে পুলিশ বা সমাজকর্মীদের কাছে যান। এছাড়া কিশোর-কিশোরীদের অনলাইন নিরাপত্তার বিষয়ে শিক্ষা দেয় এই অ্যাপ। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে ইন্টারনেট সেইফটি নিয়ে সেমিনারের মাধ্যমে সাদাত ৪৫ হাজারের বেশি শিশু ও কিশোর-কিশোরীর কাছে তার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। নিজের এলাকার প্রতিটি স্কুলে 'সাইবার ক্লাবস' তৈরি করেছেন। এসব ক্লাবে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ইন্টারনেট সম্পর্কে জানার সুযোগ দেওয়া হয়। এখন নিজের লোকালয় ছাড়িয়ে বাংলাদেশ জুড়ে সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তার অ্যাপকে কাজে লাগাতে চান

সাদাত। বাংলাদেশে সাইবার বুলিংয়ের ক্ষেত্রে প্রধান বিষয়গুলোর একটি হচ্ছে, শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা এর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ বা বাবা-মাকে বলতে ভয় পায়। এই অ্যাপ তাদের নিরাপদ ইন্টারনেটের ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি গোপনীয়তার সঙ্গে সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর সুযোগ করে দেয়। এই সংগঠনের মাধ্যমে সাইবার বিশেষজ্ঞ, সোশ্যাল ওয়ার্কার ও পুলিশকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছে সাদাত।

নিজেকে সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈন্য উল্লেখ করে এ লড়াই চালিয়ে যেতে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন সাদাত। তিনি বলেন, 'আমি একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করি এবং আমি খুবই সাধারণ একটি ছেলে। আমি যদি সাইবার বুলিং থেকে কিশোর-কিশোরীদের রক্ষা করতে পারি তাহলে অন্যরা কেন পারবে না?' পুরস্কার গ্রহণ করে রহমান জানান যে, 'বাংলাদেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রায় অর্ধেক তরুণ সাইবার বুলিং-এর শিকার হয়েছেন। কিন্তু ভয় এবং জ্ঞানের অভাব থাকায় তাদের অনেকেই এসব ঘটনা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে জানাননি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, 'সচেতনতা, সহানুভূতি, কাউন্সেলিং এবং যথাসময়ে পদক্ষেপ- এই চারটি বিষয় হলো সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চালক শক্তি। সাইবার বুলিং-এর বিরুদ্ধে লড়াই অনেকটা যুদ্ধের মতো এবং এই যুদ্ধে আমিও একজন যোদ্ধা। যদি সবাই আমাকে সমর্থন করে যায়, তবে একসাথে আমরা সাইবার বুলিং-এর বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে জয়ী হব।'

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী মালালা ইউসুফজাই অনলাইনে অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে সাদাতকে অণুপ্রেরণা দেন। এক ভার্চুয়াল বক্তব্যে বাংলাদেশের এই কিশোরকে নিয়ে মালালা বলেন, সে বিশ্বজুড়ে তরুণ-তরুণীদের সাইবার বুলিং বন্ধ করতে এবং তাদের সম্প্রদায়ের সমবয়সীদের যারা মানসিক সহিংসতায় ভুগছে তাদের সহায়তা করার আহ্বান জানাচ্ছে। সাদাত একজন সত্যিকারের পরিবর্তনকারী।

শিশু অধিকার নিয়ে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার ঘোষণা করে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক কিডস রাইটস ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা। এর আগে সুইডিশ কিশোরী গ্রেটা থানবার্গের মতো অনেকেই এ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সিরা এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন। আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার এমন একটি বার্ষিক পুরস্কার যা শিশুদের অধিকারের কথা প্রচার করে এবং তরুণদের কাজকে স্বীকৃতি দেয়।

কিডস রাইটসের বিশেষজ্ঞ কমিটি ৪২টি দেশের ১৪২ জন প্রতিযোগীর মধ্যে সাদাতকে এ বছরের পুরস্কারের জন্য বিজয়ী ঘোষণা করেছেন বলে সংগঠনটির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে। সাদাতকে নিয়ে কিডস রাইটস লিখেছে, বাবা পোস্ট মাস্টার হওয়ায় এই কিশোর শৈশবেই বাংলাদেশের অনেক জায়গা ঘুরেছেন। এটা তার জন্য কষ্টকর হলেও প্রতিটি জায়গায় তিনি নতুন কিছু শিখেছেন এবং নতুন নতুন বন্ধু তৈরি করেছেন। ইন্টারনেটে অভ্যস্ত হয়ে তিনি ভিডিও নির্মাণ ও ওয়েবসাইট তৈরিতে মনোযোগী হন। এই সময়ে তার যে অনলাইন দক্ষতা তৈরি হয় তা পরে কাজে লাগে। এখন তিনি নিজের গড়ে তোলা সংগঠন 'নড়াইল ভলান্টিয়ার্স' এবং সাইবার বুলিং বিরোধী অ্যাপ 'সাইবার টিনস' এর মাধ্যমে অন্যান্য শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সহায়তায় ওই দক্ষতা কাজে লাগান। এই পুরস্কার অর্জনের মধ্য দিয়ে তিনি একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম পেলেন, যা তাকে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে তার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ করে দেবে,'

আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কারের অর্থমূল্য সাইবার বুলিং রোধী অ্যাপটি বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে দেয়ার কাজে খরচ করা হবে বলে জানিয়েছেন সাদাত রহমান। ■

লেখক: প্রবন্ধিক

সাইবার বুলিং কী

বাদল হোসেন

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে অনেকে এখন নানা ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, টুইটার, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদির মাধ্যমে তারা সাইবার অপরাধীদের শিকারে পরিণত হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাইবার বুলিং। নারীরা ও শিশুরা এর প্রধান শিকার। ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে কারো ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করা, ভয় দেখানো বা মানসিক নির্যাতন বা অন্যায় কোনো কিছুতে প্রলুব্ধ করা ইত্যাদি হলো সাইবার বুলিং।

কিশোর-কিশোরীরাই প্রথম দিকে এ ধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছিল। এখন মধ্যবয়সীরাও এ ফাঁদে পা দিচ্ছেন। বাংলাদেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীসহ ফেসবুক ব্যবহারকারীদের একটি বড়ো অংশ সাইবার বুলিংয়ের শিকার। তথ্য-উপাত্ত বলছে দেশের ৪৯ শতাংশ স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থী সাইবার বুলিং-এর নিয়মিত শিকার। তবে এ বিষয়টি অপ্রকাশিতই থেকে যায়। মাত্র ২৬ শতাংশ অনলাইনে নির্যাতনের বিষয়টি প্রকাশ করে অভিযোগ দায়ের করেন। বাকিরা ভয়ে থাকেন অভিযোগ করলেই তাদের সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হবে ভেবে। ফলে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড হতাশা, পড়াশোনায় অমনোযোগিতা, অনিদ্রা ইত্যাদি নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। এমনকি আত্মহননের ঘটনাও ঘটতে পারে।

সাইবার বুলিং-এ চুপ থাকার নীতিই ক্ষতির অন্যতম কারণ। পরিবারের কথা ভেবে কিংবা সম্মান হারানোর ভয়ে অনেকেই সব 'চুপচাপ' সয়ে যান কিংবা চেপে যান। অপরাধীরা এর ফলে আরো বেশি সুযোগ নেয়। বাবা-মা যদি সহজেই সন্তানের বন্ধু হতে পারেন তাহলে এ সংকট সহজেই পার করা যায়। সাইবার বুলিং কী, ভার্চুয়াল জগতের পরিচিতরা কেন অনিরাপদ এবং একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য কেন সবার সঙ্গে শেয়ার করা যাবে না- এগুলো সন্তানদের বুঝিয়ে বলতে হবে। যদি বিষয়টি পারিবারিক গণ্ডির বাইরে চলে যায় তবে আইনের আশ্রয় নিতেই হবে। এক্ষেত্রে 'পুলিশি ঝামেলা' এড়িয়ে চললেই বরং বিপদ। এর মধ্যে প্রথম কাজ হচ্ছে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা। তবে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা না নিয়ে একা একা থানায় যাওয়াটাও বোকামি। সঙ্গে রাখতে হবে হয়রানির প্রমাণও, স্ক্রিন শট কিংবা মেসেজ। হয়রানির শিকার যে কেউ এখন ৯৯৯ অথবা পুলিশের ফেসবুকে পেজে নক করলেও সহায়তা পাবেন। এ ছাড়া মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হটলাইন ১০৯২১ নম্বরে গোপনীয়তা রক্ষা করে এ ধরনের সমস্যার সমাধান করা হয়। সরাসরি বিটিআরসি'র ফোনে ও ই-মেইলেও অভিযোগ করা যায়। অপরাধের শুরু যে অনলাইনের মাধ্যমে শেষও করতে হবে সেই মাধ্যমেই। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

মাঘের শীতে

মোরশেদ কমল

মাঘের শীতে বাঘ পালায়
বলত এটা মা-খালায়
বলত জড়া গরম কাপড়
নইলে পাবে টের;
ঠান্ডা জ্বরে ভুগতে হবে
বুঝলি রে শমসের।

তাঁদের কথা নিইনি কানে
বুঝিইনি সেই কথার মানে
মাঘের শীতে উদোম গায়ে
দিলাম কষে ঘুম ...
হায়রে এখন সর্দি- জ্বরে
প্রাণ হতে চায় গুম।

হাড়ে হাড়ে বুঝছি এখন
মা-খালারাই ঠিক...
মুরব্বিরাই দেখিয়ে দিতে
পারেন সঠিক দিক।

বাংলাদেশে আসা হলো না

মঞ্জুর করীম খান

জন্ম: ৩০শে অক্টোবর ১৯৬০
মৃত্যু: ২৫শে নভেম্বর ২০২০

রাত জেগে খেলা দেখার নেশায় বুঁদ হয়ে পড়াই বুঝিয়ে দেয় বাংলাদেশের মানুষ কতটা ফুটবল পাগল। এই ভালোবাসা সম্ভবত গড়ে উঠেছিল ১৯৮৬ বিশ্বকাপে ডিয়াগো ম্যারাডোনার ফুটবলের জাদুকরি নৈপুণ্যে। সেই সূত্র ধরেই কিংবদন্তী এই ফুটবলারকে বাংলাদেশে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল। অবশেষে আসা হলো না আর্জেন্টিনার এই ফুটবল জাদুকরের।

ম্যারাডোনার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের যে ভালোবাসা ছিল তা তিনি শুনেছেন কিন্তু সেটি দেখা হলো না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আসার সম্মতি দিয়েছিলেন ম্যারাডোনা। কিন্তু মুজিববর্ষের শুরুতেই দেখা দেয় বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। যার ফলে মুজিববর্ষের যাবতীয় অনুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে সবাইকে ছেড়ে তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

বাংলাদেশের একটি সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ম্যারাডোনা বলেছিলেন, সময় পেলে বাংলাদেশে যাব। তখন তাকে জানানো হয়েছিল যে, বাংলাদেশের মানুষ আপনাকে ভীষণ ভালোবাসে। '৯৪-এর বিশ্বকাপ ফুটবলের মাঝপথে তিনি খেলতে না পারায় বাংলাদেশের অনেক মানুষ কেঁদেছিলেন। একথা শুনে তিনি অবাক হয়েছিলেন। ম্যারাডোনা বলেছিলেন, 'ও, বাআআআংলাদেশ! হুম হুম হুম।

ম্যারাডোনা বাংলাদেশে না আসলেও বাংলাদেশের ইউনিফায়েড ফুটবল দল ২০১৮ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের গেমসে খেলতে গিয়ে ম্যারাডোনার সান্নিধ্য পেয়েছিল। ফুটবলারদের সাথে দারুণ কিছু সময় কাটানোর পর সেই মুহূর্তে তোলা ছবিগুলো সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছিলেন, *'বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা আমার বন্ধুরা, যারা ২০১৯ সালে আবুধাবির স্পেশাল অলিম্পিকে অংশ নিতে যাচ্ছে, বধির এই খেলোয়ারদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আল-ফুজাইরা ক্লাব আমাদের সঙ্গে অনুশীলনের জন্য'।*

ফুটবল দুনিয়া কাঁপিয়ে দেওয়া ম্যারাডোনা আজ আর আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের হৃদয়ে। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

নিপাহ ভাইরাস
সচেতনতাই মুক্তি

মো. জামাল উদ্দিন

বন্ধুরা, তোমরা সবাই বাসায় থাকবে এবং সাবধানে থাকবে। শীতের এই সময়ে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ওয়েভ চলছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে কী সমস্যা হয়, সে সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই জানো। এছাড়াও আজকে তোমাদের আরেকটি ভাইরাসের কথা বলব। এই ভাইরাসটির হলো– নিপাহ ভাইরাস। এটি এক ধরনের আরএনএ ভাইরাস। সংক্রমিত পশু ও মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। এটি ১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে প্রথম দেখা যায়। সুঙ্গাই নিপাহ নামক মালয়েশিয়ার একটি গ্রামে প্রথম শনাক্ত হয়। সে কারণে এই ভাইরাসের নামকরণ করা হয় নিপাহ ভাইরাস। গ্রামে যাতে এই রোগ ছড়িয়ে না পড়ে সেই জন্য লক্ষ লক্ষ শূকরকে মেরেও ফেলা হয় সেই সময়। বাংলাদেশেও এ ভাইরাস রয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণত বাদুড়ের মাধ্যমে এ ভাইরাসের বিস্তার ঘটে। বাদুরের খাওয়া ফলমূল ও খেজুরের রস নিপাহ ভাইরাস বিস্তারের প্রধান কারণ।

সংক্রমণের ৩-১৪ দিনের মধ্যে রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। প্রাথমিক লক্ষণ হলো জ্বর, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা, বমিভাব, গলাব্যথা, কাশি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি। রোগের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাসটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত করে এবং তীব্র জ্বরের পাশাপাশি রোগী অচেতন হয়ে পড়ে। একইসঙ্গে খিঁচুনি ও প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।

নিপাহ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার এসব লক্ষণ দেখা দিলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া রোগটি ছোঁয়াচে হওয়ায় আক্রান্তদের পরিচর্যার সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অন্যান্য ছোঁয়াচে রোগের মতো নিপাহ এনকেফালাইটিসও প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেহেতু বাদুড়ই এ ভাইরাস ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম, তাই বাদুড় থেকে মানুষকে দূরে থাকার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

গাছে বাঁধা হাঁড়ি থেকে বাদুড়ের দল খেজুরের রস পান করার চেষ্টাকালে রসের সঙ্গে তাদের লালার সংমিশ্রণ ঘটে। পরে এ রস যখন মানুষ পান করে, তখনই ঘটে বিপত্তি। মানুষ নিজের অজান্তেই সংক্রমিত হয় প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে। তবে খেজুরের রস ছাড়াও বাদুড়ের আধখাওয়া ফল ও নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত কোনো মানুষ থেকেও এ ভাইরাস ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে।

এখন শীতকাল, খেজুরের রস, তালের রস খাওয়ার উপযুক্ত সময়, তাই রস সংগ্রহে একটু সাবধান থাকতে হবে। বাদুড় যাতে খেজুর ও তালের রস পান করতে না পারে, সে জন্য হাঁড়ির মুখ ও রস বের হওয়ার স্থানটুকু বাঁশের খাঁচা কিংবা কাপড় দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিতে হবে। পাশাপাশি শিশুদের বিড়াল, কবুতর, কুকুর ইত্যাদি পোষা প্রাণীর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণজনিত রোগটি বিশ্বে মহামারি সৃষ্টি করতে পারে। যদিও প্রতিষেধক হিসেবে এর ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, তবে কবে নাগাদ তা পাওয়া যাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ■

বর্ষসেরা শিশু গীতাঞ্জলী

জান্নাতে রোজী

প্রথমবারের মতো বর্ষসেরা শিশুর যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে সেরা হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান গীতাঞ্জলী রাও। বর্ষসেরা শিশুর এ তালিকা ৩রা ডিসেম্বর প্রকাশ করেছে বিখ্যাত মার্কিন সাময়িকী টাইমস ম্যাগাজিন। এ তালিকায় গীতাঞ্জলীকে 'কিড অব দ্য ইয়ার' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

হিন্দুস্তান টাইমস জানায়, ৮ থেকে ১৬ বছর বয়সি পাঁচ হাজারের বেশি শিশুর মধ্য থেকে বিজ্ঞান ও শিল্পসহ নানা ক্ষেত্রে অবদানের ভিত্তিতে ১৫ বছর বয়সি গীতাঞ্জলী রাওকে নির্বাচিত করা হয়। ২০১৯ সালে ফোর্বস -এর অনূর্ধ্ব ত্রিশ বছর বয়সিদের তালিকায়ও স্থান পেয়েছিল গীতাঞ্জলী।

গীতাঞ্জলী রাও বসবাস করে যুক্তরাষ্ট্রে। গীতা জানায়, বড়ো হয়ে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে জেনেটিকস ও এপিডেমিওলজি নিয়ে পড়তে চায় সে। নিজের বিজ্ঞানী হওয়ার গতিপথ নিয়ে গীতাঞ্জলী জানায়, সে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই স্বপ্ন দেখা শুরু করে। কীভাবে প্রযুক্তি দিয়ে সমাজে পরিবর্তন আনা যায় সেই ভাবনা তার মধ্যে চলে আসে। ১০ বছর বয়সেই সে তার বাবা-মাকে জানায় যে, পানির মান যাচাই করতে সে কার্বন ন্যানোটিউব সেন্সর প্রযুক্তি নিয়ে ওয়াটার কোয়ালিটি রিসার্চ ল্যাবে কাজ করতে চায়। গীতাঞ্জলী উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তির মধ্যে দূষিত পানি শনাক্ত করতে পারে এমন প্রযুক্তি ছাড়াও সাইবার বুলিং শনাক্ত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে এমন একটি অ্যাপ এবং ক্রোম এক্সটেনশানও রয়েছে।

টাইমস ম্যাগাজিনের প্রোফাইলের জন্য দেওয়া সাক্ষাৎকারে গীতাঞ্জলী বলেন, প্রতিটি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন না। বরং আপনি এমন বিষয়ে মনোযোগ দিন, যা আপনাকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। কোনো একটি বিষয় নিয়ে কথা বলুন।

উল্লেখ্য, কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক গীতাঞ্জলী দ্রুত ও কম খরচে সীসা-দূষিত পানি শনাক্তের যন্ত্র আবিষ্কার করে ১১ বছর বয়সেই জিতে নেয় 'আমেরিকার শীর্ষ তরুণ বিজ্ঞানী'র খেতাব। ■

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

মুজিববর্ষ ট্রফি বাংলাদেশের

বন্ধুরা, প্রায় দেড় যুগ বাংলাদেশ ফুটবল ছিল ট্রফি শূন্য। ২০০৩ সালে ঢাকায় সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে

শেষ ট্রফি জিতেছিল। তবে আনন্দের খবর হচ্ছে, অনেক বছর পর হলেও বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামেই ট্রফি এল বাংলাদেশের ঘরে। এই নভেম্বরে 'মুজিববর্ষ' ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতিম্যাচে ২-০ গোলে জয় লাভ করে বাংলাদেশ সিরিজ জিতে ট্রফির উৎসবে মেতে ওঠে। এ বিজয় বাংলাদেশের জন্য প্রশংসনীয়।

বিশ্ব সেরা বাংলাদেশের গবেষক

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার কৃতী সন্তান অধ্যাপক ড. সাঈদুর রহমান। জানো বন্ধুরা, বিশ্ব সেরা গবেষকের তালিকায় স্থান পেয়েছে তার নাম। তিনি যুক্তরাজ্যের ল্যাঙ্কাস্টারের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শক্তি প্রযুক্তি বিভাগ এবং মালয়েশিয়ার সানওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৮ই নভেম্বর যুক্তরাজ্যের ল্যাঙ্কাস্টারের জরিপে ২০২০ সালের সেরা চার গবেষকের তালিকায় তার নাম প্রকাশ করা হয়। ঐ তালিকার সেরা চারের মধ্যে তিনি রয়েছেন। গত ডিসেম্বরে তিনি মালয়েশিয়ার সানওয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণায় পুরস্কার পান। বিশ্বের ৫ শতাধিক জার্নালে তার গবেষণা প্রকাশ করা হয়েছে। ড. সাঈদুর রহমান বাংলাদেশের গর্ব।

প্রথম খুদে বাংলাদেশি প্রাকৃতিক স্বর্গে

ফায়েল ইকবাল আরাফ রহমান ছোট্ট একজন বন্ধু। বয়স মাত্র সাত মাস। কিন্তু এত ছোট্ট মানুষটি

কী করে পা রাখল প্রাকৃতিক স্বর্গে! হ্যাঁ বন্ধুরা, বলছি বলছি। আরাফ তার মা-বাবার সঙ্গে পৃথিবীর উত্তর মেরু বলয়ের আর্কটিক সার্কেলে পা রাখে। বাংলাদেশি আরাফ গত ২০শে নভেম্বর পরিবারের সঙ্গে পাড়ি জমায় ফিনল্যান্ডের রোভানিয়েমির সাড়ে ৬৬ ডিগ্রি অবস্থানের আর্কটিক সার্কেলে। এ সময় কর্তৃপক্ষ তাকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করে। ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকি থেকে প্রায় সাড়ে আটশ কি.মি. দূরে এটির অবস্থান। বছরে স্বল্প সময় সূর্যের আলো পড়া এক নৈসর্গিক জগত আর্কটিক সার্কেল। গ্রীষ্মকালে কিছুদিন সূর্য অস্ত যায় না এখানে, যাকে পোলার ডে বলে। আবার শীতকালে কিছুদিন সূর্য উদয় হয় না, যাকে পোলার নাইট বলে। আর্কটিক সার্কেল অঞ্চলটি আর্কটিক ওসান, রাশিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা প্রভৃতি দেশের উত্তরের অংশ নিয়ে গঠিত।

বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্টে ১১৫ দেশ ভ্রমণ

বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে কাজী আসমা আজমেরী ভ্রমণ করেছেন ১১৫টি দেশ। তিনি

নিজেকে একজন বাংলাদেশের পাসপোর্টের প্রতিনিধিত্বকারী মনে করেন। বিশ্ব ভ্রমণের নেশায় ছুটে চলেন আসমা। তিনি প্রথম বিদেশ ভ্রমণ শুরু করেন ২০০৭ সালে। আসমা বিশ্বকে জানাতে চায় যে, বাংলাদেশিরা তাদের পাসপোর্ট নিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্ত ঘুরে বেড়াতে পারে।

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশিঃ ২. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে সহযোগিতা দানকারী প্রতিবেশী দেশ, ৩. বিজয় দিবসে কতবার তোপধ্বনি দেওয়া হয়, ৫. বাংলাদেশের মুদ্রার নাম, ৬. বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত

উপর-নিচঃ ১. জাতীয় স্মৃতিসৌধ ঢাকার কোথায় অবস্থিত, ৩. সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কে উপস্থিত ছিলেন, ৪.বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ

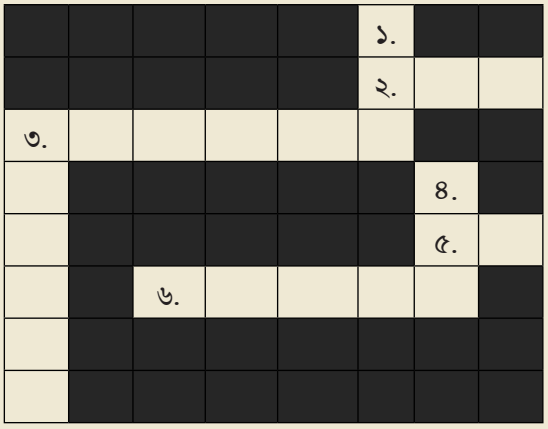

ছক মিলাও

শব্দধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেতঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, কাগজ, মোহর, আমজনতা, মহানায়ক, নাসিকা

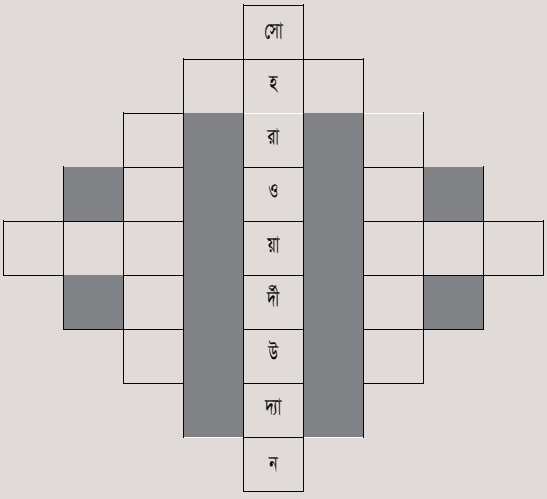

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

২	*		-	১	=	
+		*		*		+
	*	২	-		=	৬
-		-		-		+
৪	*		-	২	=	
=		=		=		=
	*	৫	-		=	১৩

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৫		৯		১১	৭২			৬৯
	৭		১৩				৭৯	
৩		১		১৫		৮১		
	২৩		১৯		৭৫		৭৭	
২৫		২১		১৭		৬১		৬৫
	৩৫		৩৯		৫৯		৬৩	
		৩৭				৫৭	৫২	৫১
	৩৩		৪৩	৪২	৫৫		৫৩	
২৯		৩১		৪৫				৪৯

মুজিববর্ষের ঘোষণা

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য সুখবর। নবারুণের 'বুদ্ধিতে ধার দাও' এতদিন খেলে উত্তর পাঠিয়েছ কিন্তু কোনো উপহার পাওনি। এপ্রিল ২০২০ সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে উপহারের পালা। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ীকে দেওয়া হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার প্রাইজবন্ড। এজন্য নবারুণ পত্রিকার পাতা (ফটোকপি প্রযোজ্য নয়) পূরণ করে বন্ধ খামে পাঠাতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই লিখতে হবে 'বুদ্ধিতে ধার দাও'। পাঠাবে এই ঠিকানায়—

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

বুদ্ধিতে ধার দাও

অক্টোবর ২০২০ -এর সমাধান

শব্দধাঁধা

	অ	ক্টো	ব	র		গ	
	ক্টো			স	জা	রু	
	পা		মা	মা			
আ	স	ল		লা			
না		ণ্ড		ই	ং	রে	জি
র		ভ					
		ণ্ড					প্ল
					ট	মে	টো

ছক মিলাও

		আ				
		খা	বা	র		
	আ		ল		ক	
	গ	মু		বৃ	রু	ই
পা	র	দ		দ্ধ	ণা	
	ল	রি		ব	ম	লা
		য়া		নি	ল	য়
				তা		

ব্রেইন ইকুয়েশন

৮	+	২	-	৬	=	৪
+		*		/		+
৩	+	৪	/	২	=	৫
-		-		-		+
৪	-	২	*	১	=	২
=		=		=		=
৭	+	৬	-	২	=	১১

নাম্ব্রিক্স

৬৩	৬২	৪৯	৪৮	৪৫	৪৪	৩	৪	৫
৬৪	৬১	৫০	৪৭	৪৬	৪৩	২	৭	৬
৬৫	৬০	৫১	৫২	৫৩	৪২	১	৮	৯
৬৬	৫৯	৫৮	৫৭	৫৪	৪১	১৬	১৫	১০
৬৭	৬৮	৬৯	৫৬	৫৫	৪০	১৭	১৪	১১
৭৮	৭৯	৭০	৩৫	৩৬	৩৯	১৮	১৩	১২
৭৭	৮০	৭১	৩৪	৩৭	৩৮	১৯	২০	২১
৭৬	৮১	৭২	৩৩	৩০	২৯	২৬	২৫	২২
৭৫	৭৪	৭৩	৩২	৩১	২৮	২৭	২৪	২৩

শুভ সরকার, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, এস. এম মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

কায়নাত মারিয়া, ৩য় শ্রেণি, পাইলট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাঁদপুর